সহকারী সম্পাদক
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

প্রচ্ছদ শিল্পী
শিশির ভট্টাচার্য

মুদ্রণে
বুলবুল চৌধুরী
কথারূপ

যোগাযোগ
১৩৪ পশ্চিম ধানমন্ডি
ঢাকা—৯

আবিদ আজাদ
শিহাব সরকার
মাহবুব হাসান
মুজিবুল হক কবীর
জাহাঙ্গীর ফিরোজ
মাহবুব কামরান
নাসিমা সুলতানা
রমেশ রায়
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল
নাঈম হাসান
জাহিদ মুস্তাফা
হারুন রশিদ

অনেক জল্পনা কল্পনার পর 'নতুন কবিতা' বেরুলো। চারিত্র সৃষ্টিতে আমাদের আংশিক ব্যর্থতা আমরা স্বীকার করি।

প্রচুর সাড়া আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু এমন একজনেও খুঁজে পাইনি যার কবিতা ছাপানো যায়। আমাদের ইচ্ছে ছিলো সম্প্রতি যারা কবিতা লেখার চেষ্টা করছেন, তেমন দু'একজনকে উপস্থিত করবার। পারিনি।

'নতুন কবিতা' শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিশীল এবং সম্ভাবনাময় তরুণদের কাগজ। এখানে কোনো দশকের ভেবড়ানো কবির (?) স্থান নেই।

এ সংখ্যায় যাদের লেখা ছাপানো গেলো, নিঃসন্দেহে এদের মধ্যে কবিতাঙ্গনে নিজেদের অমোঘ ভিতকে পাকা করেছেন কেউ, কেউ তৈরি করতে ব্যস্ত। কেউ আবার দোরগোড়ায় সম্ভাবনার পা রেখেছেন সবে।

এছাড়া আরো দু'একজনের কবিতা যার সম্ভাবনাময়ী, স্থানাভাবে বাদ দিতে হলো।

'নতুন কবিতা'য় ছাপানো লেখার জন্যে লেখকদের সম্মানী দেয়া হবে। আমরা বিতর্কমূলক লেখা চাই।

শেষ পর্যন্ত কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকেই গেলো। আগামীতে আমাদের প্রচেষ্টা সফল করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তবে এজন্যে লেখক, পাঠক সকলেরই সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

আবিদ আজাদ

মানবজমিন

প্রত্যেক মানুষই তার জটিলকুটিল সমাজ-সংসারের মধ্যে একটি জায়গায়, ভীষণ একা একজন মানুষ। একটি নিঃসঙ্গ চন্দ্রগ্রস্ত দ্বীপ। যেমন একটি মাকড়সা কুৎসিৎ-হিংস্র হাত পায়ের জীবনশুদ্ধ তার মায়াবী সুন্দর শিশিরোজ্জ্বল নেকাবসদৃশ জালের কেন্দ্রস্থলে, একজন অর্জুনগাছ খুব কুয়াশার ভিতরে তার আশেপাশের আর দশজন ছায়াচ্ছন্ন অর্জুনগাছের পার্শ্ববর্তী জীবনে। তো এই বিষণ্ন মাকড়সা আর এই অর্জুনগাছ—এরা প্রত্যেকেই প্রাকৃতিকভাবে নিঃসঙ্গ—পৃথক। আসলে লতাগুল্মময় সমাজ জীবন এবং নৈঃসঙ্গ-বাঁধা অতিনির্জনের আত্মগত একাকী ভুবন—এই দুটি স্বাধীন গোলার্ধের মধ্যেই তো বন্দী আমাদের স্বার্থপর, বিবেকহীন এবং প্রিয় নৈরাজ্যময় জীবন। আহা ! আমাদের মানব জীবন। আমাদের মরমী এবং মায়াবাদী দার্শনিকরা আর একটু বাঁদর সুলভ আদর দিয়েই অবশ্য একেই বলেছেন 'মানবজমিন' !

এই মানবজমিন শব্দটি নিঃসন্দেহে এই উপদ্রুত পৃথিবী নাম্নী গ্রহটির নাভিদেশ জুড়ে কালোমেঘের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানবজাতির একটি আবাসিক লোকশব্দ। সর্বার্থেই—এমনকি নৃতাত্ত্বিক ভাবেও। সন্দেহ নেই এই মানচিত্রহীন শব্দবন্ধটির গায়ে এখনো লেপ্টে আছে দীর্ঘস্থায়ী ইটপাথরটিনকরোগেটচুনসুরকির আস্তর।

কিন্তু সত্যি কি আজও অপরিবর্তিত আছে আমাদের প্রিয় মানব জমিন ? না নেই। মণ্ডস্থ দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের দানবীয় নাটকের পর এই প্রথম মানবজমিন কেঁপে উঠলো। দেখা গেলো ভীষণ হিংস্র ফাটল। কারণ, মানুষ দেখলো তার ঈশ্বর উধাও, তার 'বিশ্বাস' পলাতক। অর্থাৎ সমস্ত খরচ করে দিয়ে হাতে আছে শুধু

একটা কানা-পয়সার মতো বিশাল সুগোল বর্ণোজ্জ্বল নাস্তি। আর আবাদ হলোনা সাধের মানবজমিন। না, ঠিক বলা হলো না, আসলে আবাদ হলো ঠিকই, কিন্তু সে আবাদ মৃত্যুর, যুদ্ধের, জরার এবং ভয়ংকরের।

মানবজমির বক্ষসুধাধারালালিত যে মহান তরুটি এতোদিন ছিলো মানুষের মাথার উপর পরম নির্ভরতা– হ্যাঁ, হঠাৎই বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ অনাস্থার ডালপালার সমাহার নিয়েই সেই তরুটিই হয়ে গেলো বিষবৃক্ষ। আমাদের বিষবৃক্ষ।

এভাবেই জন্ম হলো বীভৎস সুন্দরের। বদলে গেলো সব। ইয়েটস্ জানিয়ে দিলেন—সারাবিশ্বকে—**And changed, changed, utterly and a terrible beauty is born.** উপরন্তু বস্তুবিজ্ঞানের সূচীভেদ্য আলো পড়ে একে একে উদঘাটিত হলো পরম নাস্তির শতসহস্র সোনা পিচ্ছিল ঝলমলে যোনিমুখ এবং ফ্রয়েডীয় মনোবিকলণ প্রভাতরবির মতো তার কিরণ পাঠিয়ে দিলো মাতৃ-হন্তারকের মাথার ভিতরে, পুরুষের পরাবাস্তবে এবং মানবীর নুনচর্বিমাখা গুহায়। বিংশতির কোলজোড়া অবগুন্ঠনের উন্মোচনে উদ্ভাসিত হলো এক অতি পবিত্র ঘৃণ্য শিশু—এক মর্মান্তিক শূন্যের ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার অনিবার্য নিয়তি নিয়ে এই-ভাবে ভূমিষ্ট হলো 'আধুনিক মানুষ'। সব মিলিয়ে মানুষ অবশেষে এই প্রথম ভাগ্যহত উদ্বাস্তু প্রাণীকুলের প্রথম সারির নেতৃত্বে গিয়ে দাঁড়ালো তার বিষাদাচ্ছন্ন তূর্যনাদ নিয়ে জনতার ভিতরের একান্ত নির্জন কোণটিতে।

কিন্তু এ ছিলো বিষাদঝড়ের শুরু মাত্র। তারপরও বদলে গেলো সব। বদলে গেলো এই গ্রহের লক্ষ কোটি বছরের যাপিত দিনরাত্রির গীত হয়ে আসা মানবগোষ্ঠীর প্রভাত ও সন্ধ্যাসঙ্গীত-মালা। অবশেষে বদলে গেলো অভ্যস্থ ঘরের ধারণা। প্রকৃত অর্থে মানুষ হারালো ঘরবাড়ি। কি বাস্তবে, কি চৈতন্যে।

আর এখানেই শুভারম্ভ আধুনিক শিল্পকলা এবং সাহিত্যের।

সমাজ জটলার অতিকায় অন্দরমহল পিছনে ফেলে ছুটলো মানুষ একফোঁটা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। কে দেবে সেই আশ্রয় ? কে শোনাবে তাড়িত উন্মাদ-প্রায় মানবজাতিকে বরাভয়ের শ্লোক ? এমন একটি উদ্ভিদও নেই, যার লোকাতিত ছায়া আতংকের দাগ লেগে থাকা মানুষের করতলে জড়িয়ে দিতে পারে শীতল ছায়ার ব্যান্ডেজ। এমন কোনো আকৃতির একটি বাসস্থানও নেই, যে তার কমলারঙের অভ্যন্তরভাগ খুলে দেবে এই তাড়িত ছুটন্ত আত্ম-ধিক্কারের বর্শায় গাঁথা মানবকে। আর স্নানরতা নারীর রূপোলী সানুদেশ জুড়ে জ্বলন্ত আগুন দেখে নিজেকে অবশেষে পশমের চেয়ে বেশী মূল্যবান পণ্য মনে করে তুলে দিলো দেশের সীমান্ত ভাংগা কালো ব্যবসার গোপন চোরাই পথে—মার্কেন্টাইল মূল্যবোধে।

হ্যাঁ, এইভাবেই শুরু। এইভাবেই বদলে গেলো কবিতা, বদলে গেলো স্থাপত্যশিল্প। একমাত্রা ভেঙে বহুমাত্রার খাঁচার ভিতরে চাহিদা নামের বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের জলরঙ আর পোড়ামাটির হাঁস। তবু একটা বিশ্বাস আলোকজ্জ্বল অন্ধকার মানুষের জন্য অবশিষ্ট থেকেই গেলো।

হোক তা সন্দেহকাতার, হোক তা ভয়ার্ত সিঁড়ি, হোক তা লোমহর্ষক বাথরুম। সার্বভৌম এই বিদেশ, মানুষ এখানেই আজও স্বদেশী। তবু এই মানবজমিন আমাদের সেই আত্মজর্জরিত আকাশের শতধাচ্ছিন্ন নীলিমার কাগজে বাঁধাই একটি নিরবচ্ছিন্ন স্বদেশ।

হারুন রশিদ

কলকাতায় মোর দিনগুলো

ছোট্টবেলা থেকেই আমার সংগে সংগে বেড়ে উঠছিলো কলকাতা যাওয়ার স্বপ্ন। স্বপ্ন ডালপালা চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পরিণত হয়েছে বিশাল বৃক্ষে। আমিও প্রতিদিন সেই ডালপালায় ছড়ানো পাতাদের সংগে মিতালী গড়েছি। যে কলকাতাকে জেনেছি, যার সম্বন্ধে চমৎকার সব কথা শুনতাম, যাকে নিয়ে কল্পনায় কথামালা গেঁথেছি, সেই কলকাতাকে কিন্তু খুঁজে পাইনি।

২৭শে অক্টোবর, ১৯৭৯। উজ্জ্বল রোদ। ঢাকা বিমান-বন্দর ছাড়লাম সাড়ে ন'টায়। বান্ধবহীন ঐ স্বল্পক্ষণেই কেমন করে উঠলো মন। যদিও বহুবার আকাশে ওড়বার অভিজ্ঞতা, বিদেশী রানওয়ে ছোঁয়ার উদ্বেলতা আমার আছে। কিন্তু কাছের-জনদের পরিমন্ডল থেকে, জন্মভূমির মাটি ছেড়ে আকাশে ভাসার মধ্যে আলাদা একটা অনুরণন থাকে। মেঘের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে কখনো, কখনো মেঘের উপর দিয়ে, আবার কখনো মেঘ কেটে কেটে দুলে দুলে যাচ্ছিলাম আমরা। অবশেষে তপ্ত-দগ্ধ দুরু-দুরু স্বপ্ন আর প্রত্যাশা বুকে আন্তর্জাতিক দমদম এয়ারপোর্টে পেঁছিলাম। সবুজের মাঝখানে ক্ষীণ সরলরেখার মতো রানওয়ে। আর এয়ারপোর্ট ভবনটি বেশ দেখতে! বিভিন্ন লৌকিকতা শেষে বাইরে এসে মুক্ত নিঃশ্বাস ফেললাম!

অভিজিৎ ঘোষের বাড়িপথে আমার ব্যাগটা ছিঁড়ে যেতে মনটা অজানা আশংকায় দুলে উঠলো। আমি কেঁপে উঠলাম। রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে চতুর্দিকের উদ্বাস্তুদের মতো অবিন্যস্ততা দেখে মনটা আরো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। রক্তশূন্যতায় ভুগছে

কলকাতা। আমি হাঁটছিলাম। ফ্ল্যাট-বাড়িতে থাকেন অভিজিৎ। কড়া নাড়তেই রত্নাবলী ঘোষ—অভিজিতের স্ত্রী, দরজা খুলে দিলেন। নাম বলতেই অভ্যর্থনা জানালেন স্নিগ্ধ হাসিতে। উনি আমার নাম আগেই শুনেছেন। আমি ঘামছিলাম। উত্তেজনায় আলাপ-চারিতা কেমন অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছিলো। বৌদি আদর-স্নেহে আমাকে ছোট্ট ভাইটির মতো কাছে টেনে নিয়েছিলেন। টেলিফোন পেয়ে কিছুক্ষণ পড়েই অফিস পালিয়ে ছুটে আসেন অভিজিৎ। কুশলাদির পর মৃদু অভিযোগও তিনি করেন কেন আগে জানাইনি, চিঠি লিখিনি ইত্যাদি।

তারপর থেকে বাংলাদেশের কবিতার চিত্রপট খুলে খুলে দেখানোই ছিলো আমার দায়িত্ব। আমি উচ্ছ্বসিত হয়েছি আমার দেশের কবিদের নিয়ে। তুলে ধরেছি বিভিন্ন পটভূমিতে। পঞ্চাশে নয়, সমগ্রতায় শামসুর রাহমান অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর সংগে একমাত্র তাঁরই তুলনা চলে। তবে আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী যা দিয়েছেন তা আর কেউ পারেননি। সৈয়দ শামসুল হকের কাছেও আমরা ঋণী। ষাটে এসে রফিক আজাদ সুতন্ত্র নির্মাণে পাঠকদেরকে নাড়া দিয়েছেন প্রচন্ডভাবে। তাঁর ঘোষণাই ছিলো আলাদা। আবদুল মান্নান সৈয়দ কবিতায় পরাবাস্তবতা নিয়ে কিছুটা দাম্ভিকভাবেই এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পাঠক মহলে তেমন তোলপাড় তুলতে পারেননি। অথচ প্রবন্ধে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আবুল হাসান অনেক বড় কবি। দুর্ভাগ্য অকালেই এ গোলাপটি ঝরে গেলো। আর নির্মলেন্দু গুণকে একদিন যেভাবে পেয়েছিলাম, যে গুণ উল্লেখযোগ্যতার দাবী করেছেন অপ্রতিহতভাবে, সে গুণ এখন খুব নিষ্প্রভ। তার প্রথম দিককার দুটি বই-ই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু সত্তুরে এসে আমাদের অবাক হতে হয়। কবিতায় আবিদ আজাদ, মাহবুব হাসান, শিহাব সরকার জ্যোৎস্নার হাতে সঁপে দিয়েছেন মানুষকে।

কথায় কথায় অভিজিৎদাকে এসব বলছিলাম। সত্তুর, আমাদের এখানকার সত্তুর, কলকাতা তথা পশ্চিম বঙ্গের তুলনায়

নিষ্ফলা ভূমি—একথা সত্যি। সেখানে আবিদ একমাত্র কবি যিনি পঞ্চাশ কিংবা ষাটের অনেক কবিকেই ছাড়িয়ে গেছেন। তার 'ঘাসের ঘটনা'ই এর প্রমাণ। এ মুহূর্তে দু'একটা লাইন মনে পড়ছে --'শুকনো হাওয়ায় মনে পড়ে নিউটাউন........... নিউটাউন.........'সেই পথে ফিরে যেতে রক্তজবা গাছের তলায়/ সূর্যোদয় আলো কি তোমার সাথে দেখা হয় তার?' মাহবুব হাসানকে কিন্তু উজ্জ্বল নক্ষত্র বললে অত্যুক্তি হবে না। তার কবিতার নতুনত্ব, বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা, শিল্পীর মতো নিখুঁত চিত্রাংকনের সাবলীলতার মধ্যে প্রকাশ পায় মননের গভীরতা। 'রোদ্দুর' একটা কবিতার কথা মনে পড়ছে---'এর মধ্যে কেউ কেউ ভীত সন্ত্রাস আনে/লুকিয়ে পকেটে/কেউবা হাতের ব্যাগে ছদ্মনামে পুরে ফ্যালে/তাজা সোরগোল, আর/রক্তপায়ী সময়ের ঘড়িঘর থেকে নিজস্ব গয়ালে/এইসব পোস্ট করে চতুর রোদ্দুর।' আর শিহাব সরকার ভিন্নতর দর্শন নিয়ে পথ চলাতে সাচ্ছন্দ গতি এনেছেন। তার কবিতা চট করে বোঝা দুরূহ। একটু ভাবায়। আন্তর্জাতিকতার রূপ পরিলক্ষিত হয় তার কবিতায় বেশি। উপরের দুজনের বেলায়ও ভাবার কথাটা প্রযোজ্য। তবে ওদের কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে, ভালো লাগে। একজন কবির জন্যে এটা নিঃসন্দেহে গৌরবের কথা। সত্তুরে মূলতঃ এ তিনজনই উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আরো দু'একজন অস্বাভাবিকভাবে কোনো কোনো সময়ে আমাদেরকে চমকে দিয়েছেন, তবে তা এতোই অল্প যে ঢাকা পড়ে যায়। সাম্প্রতিক দু'একজন তরুণ খুবই সম্ভাবনার উচ্ছলতা নিয়ে এগুচ্ছেন। এদের মধ্যে মুজিবুল হক কবীর, নাসিমা সুলতানা, শহীদুজ্জামান ফিরোজ, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, জাহিদ মুস্তাফা'র নাম উল্লেখ করা যায়। এরপর প্রসঙ্গ উঠেছিলো খালেদা এদিব চৌধুরীর। প্রসঙ্গ উঠেছিলো তার পিতৃভূমি বরিশালের। অভিজিৎ একদম খুলে মেলে দিয়েছেন নিজেকে। তার ভেতরে কোনো কার্পণ্য দেখিনি।

বিকেলে আমরা তিনজন যাই গড়ের মাঠে 'মুক্তমেলা'র আসরে। একটু একটু এগিয়ে আসছে আবছা আঁধার। মাথার উপরে পাখিরা নীড়ে ফিরছে দিনের সব লেনদেন চুকিয়ে। পিঁপড়ের মতো মানুষের মিছিল দু'পাশে। ব্যস্ত নগরীর নিয়ন আলো কল্পনা-মেদুর করে তোলে। ব্যস্ত বাস, ট্রাম, রাস্তাঘাট, চারদিক। তার মাঝখানে এই পারাপার। মুক্তির প্রান্তর। 'মুক্তমেলা' আজ এগারো বছর ধরে প্রতি শনিবার বিকেলে গড়ের মাঠে বসে। এর প্রধান হোতা হলেন কবি আবু আতাহার। এখানে কবিরা আসেন কবিতা পড়তে, গায়ক আসেন গান গাইতে, অভিনেতা আসেন অভিনয় দেখাতে, শিল্পী আসেন ছবি আঁকতে। শুনেছি আগে সব বড় বড় কবিরা আসতেন। বিভিন্ন ষ্টল হতো বইয়ের, অন্যান্য রকমারি জিনিসের। খুব জমজমাট মেলা হতো। আসতেন আরো নানান গুণীজনরা। আজ এ মুক্তমেলা জীর্ণ-শীর্ণ এলো-মেলো হয়ে পড়েছে। গুটি কজনের মিলিত কণ্ঠ গড়ের মাঠের বিশালতায় হারিয়ে যায়। শ্রীহীন মেলার কথা বলে আবু আতাহার দুঃখ করছিলেন। তাছাড়া আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন এর ভূমিকাও ছিলো অভাবনীয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে শরণার্থীদের জন্যে পুরোনো কাপড় আর চাঁদা তুলে এ মেলার সদস্যরা পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছেন।

পাশেই চৌরঙ্গী, এসপ্লানেডের দ্রুততম কল্লোল কলকাতার শরীর চুঁইয়ে পড়ছে। তবু এখানটায় কী ভীষণ নৈঃশব্দ। গাঢ় পেলবতা ঘিরে আছে গড়ের মাঠ জুড়ে। এরও রঙ আছে। এরাও কখনো কখনো মেয়েদের মতো মুখোশ পরে থাকে। মুখোশের ভেতরেও ইন্দ্রিয়ের আহার জোগায়। অথচ এখানেই কতো পতন আর শব্দময় সোহাগের বলিহারী। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নির্জন চত্বর এর স্পর্শ থেকে অব্যহতি পায়নি। রবীন্দ্র সদনও মুখোশের আড়ালে বৃত্তের মনোরঞ্জনে পতিত হচ্ছে। বিড়লা প্লানেটরিয়াম কেমন নির্বিকার নিঃশ্বাস ফেলছে। এখানেই কলকাতা মূর্ত হয়ে আছে এক বিচিত্র স্বাদে আর মাংসাশী গন্ধে।

দূরে ইডেনের দেহ কামড়ে-খিঁচড়ে তুলে নিচ্ছিলো মানুষের আনন্দ-উল্লাস। বিখ্যাত সেই রেড রোড কিংবা রেস-কোর্সের বুকে তুলে নেয়ার উদার আহ্বানও আমাকে জাগাতে পারেনি। ডালহৌসি স্কোয়ারে ঘুণে-পোকাদের আস্ফালন দেখে অবশ্য আমি চমকে উঠেছিলাম। কলকাতা তার ঐতিহ্যের কংকাল বহন করে চলছে শুধু। অন্য কিছু নয়। মোহিনী কলকাতার মধ্যরাত তাই আমাকে টানতে পারেনি।

পরদিন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতায়। অভিজিৎ ঘোষের বাবার বাড়ি। সারাটা দুপুর ছটফট বিচ্ছিন্ন স্পর্শকের মতো কাটালাম। সামনে রেললাইন, পচা এঁদো নর্দমা আর বস্তি। পাশেই বিলাসবহুল বহুতল বিশিষ্ট ফ্লাট-বাড়িগুলো। এই হলো কলকাতার অভূতপূর্ব কন্ট্রাস্ট। বিত্তবান আর বিত্তহীনদের দূরত্ব এতো বেশি যে, ধারণা করাই অনেক সময় কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এর দীর্ঘসূত্রীতা আরো বাড়ছে। সম্ভবতঃ এজন্যেই পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের রাজত্ব। এজন্যেই একদিন নকশালবাড়ি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিলো।

দুপুর মরে আসছিলো। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গোপাল সামন্ত'র বাড়ি। বেশ সম্পন্ন পরিবার। ঘুম থেকে উঠে আসলেন তিনি। আলাপ হলো। খুব আন্তরিক হলেন। এককালে প্রচুর গল্প লিখেছেন দেশ, আনন্দবাজারে। খুব অল্প সময়ে খ্যাতিও পেয়েছিলেন অনেক। ভেতরে কিছুটা ক্ষোভ পুষে রেখেছেন। গল্পে একটা নতুনত্ব, স্বাতন্ত্র্যতা আর বলিষ্ঠ বক্তব্য নিয়ে তিনি এসেছিলেন। লিখেছেন উপন্যাসও। আজ লিখছেন না। লিখতে পারছেন না অসুস্থতার পর থেকে। কথা বলেন বেশ দৃঢ়তা নিয়ে। স্পষ্টবাদী। দুঃখ করলেনঃ এখানে কারো কিছু হচ্ছেনা। কী ছাইপাশ যে লিখছে ছোকরারা আজকাল। ষ্টাবলিষ্টমেন্টের সাথে যুক্ত বলেই পার পাচ্ছে। তাঁর মতে পূর্ণেন্দু পত্রী শক্তিশালী লেখক। বারবার পত্রী'র 'আসুন বসুন' প্রবন্ধ বইটার কথা বল-ছিলেন।

বাসের অপেক্ষায় আমরা ঢাকুরিয়া ব্রীজের পাদদেশে অপেক্ষা করছিলাম। কলকাতার দালানগুলো অলস দাঁড়িয়ে আছে। রোদ শুয়ে আছে ক্লান্ত কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে। মন-খারাপ-করা বিকেল। জানালায় দু'একটি মুখ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ছাদেও কেউ কেউ। ক'টা কাক দেখলাম দাড় বাইতে বাইতে যাচ্ছে। সময় ঘোড়ার পিঠে লাফাতে লাফাতে পালাচ্ছে। আমরা পেঁছিলাম আশুতোষ কলেজের পেছনে বসন্ত বোস রোডে। এখানেই 'ইয়ং রাইটার্স' কর্তৃক আয়োজিত বিজয়া সম্মেলন ও কবিতা পাঠের আসর। ইয়ং রাইটার্সে'র মূল ব্যক্তিত্ব তিনজন—অভিজিৎ ঘোষ, প্রদীপ রায় চৌধুরী ও আবু আতাহার। এরা সত্তুরের কবি। অনেক কবির সমাবেশ ঘটেছিলো এখানে। কয়েকজন বুড়ো কবিকেও (?) দেখেছিলাম। কবিতায় হয়তো তারা কোনো ছাপই রাখতে পারেননি, পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠেনি কবিতাঙ্গন, তবু এরা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার—কোনো শ্রোতার উপস্থিতি দেখলাম না। যেন কবিদের শুধুমাত্র গেটটুগেদার। অভিজিৎদার কাছে জিজ্ঞেস করে পরে জেনেছিলাম—কলকাতায় কবিতা পাঠের আসরে মানে এমনি কোনো ঘরোয়া পরিবেশে শ্রোতা আশা করা বাহুল্য। আমাদের দেশে এমনটি কল্পনা করা যায়না।

ইতিমধ্যেই দু'একজনের সংগে আলাপ হয়েছে। আমার প্রতি অনেকের দৃষ্টিই এসে পড়ছিলো। অভিজিৎ ঘোষ এক সময় আমাকে সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দুর্ভাগ্য অনেকের নাম মনে রাখতে পারিনি।

এ অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলতে অনুরোধ করা হলো আমাকে। আমি ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। বেশ নার্ভাস লাগছিলো। সামনে কোনো ডায়াস ছিলো না। এতে আরো অসুবিধে হয়। তবু উঠে দাঁড়ালাম। কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো। সবাই যেভাবে আমাকে দেখছে তাতে একটু বেসামাল হওয়া স্বাভাবিক। তার উপর আবার সামনে অনেক মহিলা-কবি। মোটামুটি কয়েকজনের উপর সামান্য আলোচনা করেছিলাম। তেমন গুছিয়ে বলতে

পারিনি। একজন প্রশ্ন করেছিলেন—শামসুর রাহমান, আল মাহমুদের কথা। শামসুর রাহমান প্রধান কবি। আল মাহমুদ বহু বৃত্তে পদচারণা না করলেও নিঃসন্দেহে বড় কবি। সেখানে শামসুর রাহমানের গতি সর্বত্র। এবং এজন্যেই তিনি কবি হিশেবে শীর্ষে। উঠেছিলো বেলাল চৌধুরী, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, আসাদ চৌধুরী, মহাদেব সাহা, আবু কায়সার, মাহবুব সাদিকের কথা। রফিক আজাদের 'ভাত দে হারামজাদা' কবিতা-টির কথাও জানতে চেয়েছেন। এখন কে কেমন লিখছেন। সত্তুর নিয়ে কথা উঠেছিলো বেশি। বললাম, আমাদের সত্তুরে কজন মাত্র কবি। অথচ ওখানে সত্তুরের উল্লেখযোগ্য কবিদের সংখ্যা অনেক। আবিদ, মাহবুব, শিহাব, এরাই সত্তুরকে সমৃদ্ধ করেছেন বেশি। আরো আছেন। তাদের অনেকেই হারিয়ে যাচ্ছেন। মাশুক চৌধুরী, আবু করিম প্রমুখ দারুণ সম্ভাবনা নিয়ে পথ এগু-চ্ছিলেন। এদের উজ্জ্বলতা ছিলো প্রখর। অথচ আজ তারা কেমন ঝিমিয়ে পড়ছেন।

ওখানকার যাদেব উপর আলোচনা করেছিলাম তাদের সম্পর্কে আমার ধারণা পরে আরো স্বচ্ছ হয়েছে। এদের মধ্যে যারা উল্লেখ্য তাদের দৃপ্ততাই ছিলো ঐ অনুষ্ঠানের প্রাণ।

অভিজিৎ ঘোষের বই বেরিয়েছে আটটি। শেষ বইটি 'নিঃসঙ্গ মানুষ।' কবির প্রতিকৃতি দিয়ে প্রচ্ছদ করেছেন রত্নাবলী ঘোষ। উনি কবিতাও লিখছেন ইদানিং। অভিজিৎ বড়ো স্পষ্টবাদী। কাউকে পরোয়া করেন না। কবিতায় আক্রোশের, দহন আর দীপনের উচ্চারণ জোরালো। সমস্ত মূল্যবোধকে দুপায়ে মাড়িয়ে বুকের খাঁচা ফাটিয়ে হেসে ওঠেন। দুর্দমনীয় ভাব। বুক ফুলিয়ে গাঢ় জীবনের দিকে এগোন। আত্মধ্বংসী প্রবণতা বেশি। কিন্তু আন্তরিক। তাঁর সম্পাদিত অনেক বই বেরিয়েছে। 'সৈনিকের ডায়েরী'র সম্পাদক। কিছুদিন আগে বেরিয়েছে সত্তুরের দশজন কবির কবিতা সম্মিলিত বই সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এই সময়ের কবিতা'। অভি-জিতের কবিতা আছে এটাতে। ব্যক্তিগত জীবনেও অভিজিৎ বেশ

উচ্ছল আর উদ্দম। লম্বা, চৌকশ চেহারার অধিকারী। সত্তুরের একজন উজ্জ্বল, বলিষ্ঠ কবি।

প্রদীপ রায় চৌধুরী'র সাম্প্রতিক বই 'তৃষ্ণায় সমর্পিত শব্দ।' তার কবিতার প্রধান গুণ সরলতা। কবিতার দেহে পাঠককে সহজেই টেনে নিতে পারেন। অনুভবকে আন্তরিকভাবে প্রকাশ করাতেই তার কবি সত্তা ফুটে ওঠে রোমান্টিক চেতনায়। আর আবু আতাহারের বই পাইনি। তার সম্পর্কে মন্তব্য করাও ঠিক নয়। সম্মেলনে যে কবিতাটি শুনেছি তাতেই বা চট করে কী বলি। তবে এটুকু বোঝা যায়— তিনি মোটামুটি গতি নিয়ে সত্তুরের অন্যসব উল্লেখযোগ্য কবিদের সংগে এগিয়ে যাচ্ছেন।

এখানকার সম্মেলনের ধরনটা আলাদা। আমাদের দেশের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এদের পটশোভাও বিচিত্র প্রতীতে প্রতীয়মান। এজন্যেই সঠিক নিরূপন অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে পড়ে। সমকালীন চিন্তাধারায় খুব গতিশীল হলেও অনেকের কবিতায় তা ম্রিয়মান, স্থবির মনে হয়েছে আমার কাছে। হয়তোবা সেজন্যে সম্মেলনের কোথাও একটা ফাঁক থেকে গেছলো। যাহোক, কলকাতাগামী কবি সম্মেলনে কবিরাই উপস্থিত থাকেন, কবিতা পড়েন, কবিতা শোনেন। কোনো শ্রোতার উপস্থিতি ঘটেনা। অথচ এটা সর্বজনবিদিত, বাংলাদেশের কবি সম্মেলনে হাজার হাজার শ্রোতা কবিদেরকে শ্রদ্ধা জানাতে, কবিতা শুনতে ছুটে আসেন। বিজয়া-সম্মেলন সত্তুর দশকের কবিদের পদশব্দে, চোখের দৃষ্টিতে, ঝরাপাতার মর্মর গানে প্রলম্বিত হয়েছে। শুধু সত্তুর দশক। কার্ডেও তাই ঘোষণা ছিলো। অগুনতি কবির নির্মল বন্ধন। যদিও ষাটের কবিদ্বয় শান্তনু দাস আর সজল বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ আমিই ছিলাম এদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। একটা বাড়ির ছোট্ট হলরুমে এই আসরের তথা সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিলো। একটা ব্যাপার দৃষ্টি এড়ায়নি। এদেশের সত্তুরের কবিরা বেশ বয়স্ক। আমাদের সত্তুরের কবিরা অল্পবয়সী এবং টকটকে তরুণ।

এখানেই পরিচয় হয়েছে অনেক কবিদের সংগে। এরা অনেকেই আমাদের দেশে পরিচিত নন। কিন্তু কলকাতায় সত্তরের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। নির্মল বসাককে পেলাম সিঁড়িমুখে উঠতে গিয়ে। এককালে তার সংগে আমার হৃদ্যতা ছিলো গভীর। দীর্ঘদিন আমি দেশের বাইরে থাকায় যোগাযোগহীন হয়ে পড়ি সবার থেকে। মূলতঃ নির্মল বসাক আর অভিজিৎ ঘোষের টানেই আমার কলকাতা যাওয়া। নির্মলদা ইঞ্জিনিয়ার মানুষ। মধ্যবয়সে এসেছেন কবিতা করতে। তিনটি বই বেরিয়েছে। সাম্প্রতিক বই 'সময়ের খেলনা'য় তার কিছুটা উত্তরণ ঘটেছে। একটা পত্রিকায় দেখেছিলাম সত্তরের প্রধান কবিদের মধ্যে নির্মল বসাকের নাম। তার কবিতায় শব্দ, নদী, পাখি অর্থাৎ শৈশব, কৈশোরের গ্রাম-বাংলার ছবি একটু বেশি আসে। কবিতায় তার স্বতঃস্ফূর্ততা, ভাষার লাবণ্যতা চোখে পড়ার মতো। আলাদা ইমেজ উপস্থাপনায় বেশ দক্ষতা আছে। ব্যক্তি নির্মল বসাক অত্যাধিক অমায়িক, স্পর্শকাতর। মানুষদেরকে খুব কাছে টানতে পারেন।

সম্মেলনে যারা কবিতা পড়েছেন সবার নামও আমার মনে নেই। সত্যরঞ্জন বিশ্বাসকে ভোলা যায়না। তিনি 'কণ্ঠস্বরে'র প্রধান সম্পাদক। কবিতার গভীরতা আছে। শক্ত পায়ে দাঁড়াতে বদ্ধপরি-কর। কবিতায় হাঁটেন ধীর, গম্ভীরভাবে। এমনিতে বেশ সদালাপী। বাংলাদেশের ব্যাপারে আগ্রহী। আমার কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনেছেন আমাদের দেশ, আমাদের কবিতার ধারা সম্পর্কে। কল-কাতার কবিতা-আন্দোলনে শুনেছি উনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। চলন্ত ট্রেনেও কবিতা পাঠের আসর বসিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে দূরে, কলকাতা ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যেতেন। এর মূলেই, চমক কিছু মানেই সত্যরঞ্জন বিশ্বাস।

কবিতা পড়েছেন ব্রততী বিশ্বাস, সুশীল পাঁজা, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ দে, সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণ গঙ্গোপা-ধ্যায়, সুজাতা ঘোষ, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, অজিত দেব, বাদল সমাদ্দার এবং আরো অনেকে।

সুজাতা ঘোষের কবিতাটি বেশ শিল্পগুণে নিটোল ছিলো। ভালো লেগেছে। কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন সুজাতাকে শিগগির বিয়ে করছেন। চৈতালীর কবিতায় একটা আদুরে ভাব লক্ষ্য করেছি। এটা ব্যক্তি চৈতালীতে আরো প্রকট। ভালোই লেখেন। চৈতালী সুন্দরী বলে অনেকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। একজন জানালেন, তাকিয়ে লাভ নেই—বিয়ে হয়ে গেছে। আর ব্রততী বিশ্বাস এদের থেকে নিজস্ব স্টাইলে ভাস্বর। ভিড়ের মধ্যেও কবিতায় ঠিক তাকে চেনা যায়। একজন কবির পক্ষে এটা কম নয়। ব্রততীর কবিতার শিল্পমত্ততা, বলিষ্ঠতা, হৃদয়-ছোঁয়ার তড়িতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

হরিপদ দে'র বইয়ের নাম 'অরণ্যে অন্তরীণ'। তার কবিতার ভেতর একটা কাতর আবেদন খুঁজে পাই। হৃদয়ে ঝড় উঠলে বন্দরে যাবার স্বপ্ন তাকে তোলপাড় করে তোলে। একটা জোরালো ভঙ্গিতে কিছু অভিঘাত সৃষ্টি করতে হরিপদ বারবার সচেষ্ট। সুশীল পাঁজার কোনো বই বেরোয়নি। 'এই সময়ের কবিতায় দশজনের মধ্যে তিনিও একজন। তার কবিতায় প্রচণ্ড ক্ষোভ ঝরে। সমাজের বৈষম্যতা তাকে পীড়িত করে। সুশীলের কবিতার তীক্ষ্ণতায় অবাক হতে হয়। সহজেই আকৃষ্ট করে।

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় চমক আছে। কবি স্বচ্ছ করে ভাবতে বা তা প্রকাশ করতে শিখেছেন ঠিকই, কিন্তু এখনও সেই মন্ত্র তার নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। তবে মানুষ কল্যাণ এবং কবি কল্যাণের মধ্যেকার ফাঁকটুকু তিনি অতিক্রম করতে পেরেছেন। সুভাষকে নিয়ে কি লেখা যায়? সুভাষের বইয়ের নাম 'জয়ে নেই অন্বেষণে আছি।' কবিতায় বুদ্ধিমত্তা, সমর্পণ, সাবলীলতা এমন করে গেঁথে দিয়েছেন—একজন কবিতা-পাঠক তার কবিতাকে ভালোবাসবে; প্রেমে পড়ে যাবে। ভাষা ও ফর্মের উপর তার দখল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সহজ ঢংগে বলতে কবি বেশ স্বাচ্ছন্দতা বোধ করেন। সুভাষ বড়ো রোমান্টিক।

উপরের কথাগুলোই সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করেছি। নিজের

জায়গায় ফিরে এসে কবিদের সংগে ব্যক্তিগত আলাপে ভিড়ে যাই। এরই একফাঁকে গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তার পত্রিকা 'চান্দ্রমাস' দেন। মিষ্টি এবং শান্ত প্রকৃতির মানুষ গৌরশংকর কবিতা লেখেন যন্ত্রণাকাতর নাবিকের মতো। 'এই সময়ের কবিতা'র মধ্যে তার কবিতাও আছে। সমুদ্রের গানে তিনি বেশ তৃপ্ত। যৌথ জীবনের চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি ব্যবহার করেন এমন সব মানুষের কথা যাদের গ্রীবার কাছে থমথম করছে অন্ধকার, বুকের কাছে লুকিয়ে আছে আদুল কথাবার্তা। নিজস্ব রীতি ও প্রবণতা, এক ধরনের উদাসীন মনোভঙ্গি, বুদ্ধিশাসিত আবেগই তার কবিতাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। অজিত দেব ছোট-খাটো, পাতলা মানুষ। সম্পাদিত পত্রিকা 'এবং এবং কবিতা' পত্রিকাটি দিয়ে কবিতা চাইলেন। পত্রিকাটি বেশ পরিচ্ছন্ন। এই বয়সেও তার মধ্যে পত্রিকা বের করে সবাইকে বিতরণ করার যে উদ্দীপনা আর আনন্দময়তা দেখেছি তা নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী রাখে। সমীর দে রায় তুলে দিলেন তার 'পিলসুজ'। বেশ রুচির আদলতা আছে।

শান্তনু দাস ষাট দশকের অন্যতম কবি। বিখ্যাত পত্রিকা 'গঙ্গোত্রী'র সম্পাদক। শান্তনু অনেক বই সম্পাদনা করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই হলো 'স্বনির্বাচিত'। সম্প্রতি উভয় বাংলার কবিদের কবিতা নিয়ে একটা বই সম্পাদনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কাফের'। 'কাফের' নামেই দীর্ঘ একটি কবিতা আছে বইটিতে। নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর চরিত্রায়ণই ফুটে উঠেছে কাফেরে। শান্তনু কখনো ভীষণ অস্থিরতায় ছটফট করেন, কখনো ধীর স্থির মগ্ন। এই বৈপরীত্য দেখি তাঁর ব্যক্তিত্বেও। সেই শান্তনু সম্মেলনে সত্তুরের উপর আলোচনা করেছেন। বেশ বিতর্কিত। তাঁকে আবু কায়সারের দেয়া চিঠি দিলাম। বই দেয়ার কথা। আমার হাতে তড়িঘড়ি করে তিনকপি 'গঙ্গোত্রী' দিয়েই পালালেন।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋষিণ মিত্র গান গাইলেন। খুশিতে সজলের কপোল চিকচিক করছিলো। ষাটের কবিতার আলোচনায়

তাঁর নামও উল্লেখ্য। ঋষিণ মিত্র আধুনিক কবিতাকে সংগীতে রূপ দেন। গলা ভালো। কবিতাও লেখেন। এরপর হলো মিষ্টিমুখ। এসব মিলিয়ে সেদিন সেই আবদ্ধ ছোট্ট পরিসরে সত্যি-সত্যি হারিয়ে গিয়েছিলাম। আমি অভিভূত হয়েছি। তবে ষাটের তুলনায় সত্তুরের কবিরা কতোটুকু স্বতন্ত্র পথে এগুচ্ছেন তা এখনো তেমন পরিস্কার নয়।

২৯শে অক্টোবর। ঝকঝক করছে কলকাতা। অভিজিৎদা আর আমি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাসায় গেলাম। কোথায় সেই বাংগুড়া এভেন্যু। সল্ট লেকের কাছাকাছি। নতুন শহর গড়ে উঠছে এদিকটায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁকে পাইনি। তাঁর মেয়ের হাতে পত্রিকাগুলো দিয়ে এসেছি। তিনি বেশ বড়লোকও বটে। ঠিক উল্টো দিকেই পূর্ণেন্দু পত্রীর বাসা। সামনে ছোট্ট একটা চিত্রকর্ম। যে কোনো কারোর মনেই দ্বিধা থাকবে না ছবিটি দেখে—এটা পাত্রীর বাসা কিনা। হালকা পাতলা মানুষ পত্রী। বেশ সার্প। খুব অমায়িক। কতো বড়ো শিল্পী, কবি—কিন্তু কোনো গরিমা নেই।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাসখন্দের প্রসঙ্গ টানলেন। সুভাষ দত্তকে মনে পড়ে। মনে পড়ে রাজ্জাক, কবরী, ববিতাকেও। কে কেমন আছেন, কী করছেন, জানতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন শামসুর রাহমান, বেলাল চৌধুরীর কথা। 'বেলাল কেমন আছে? 'সন্ধানী'র জন্যে দীর্ঘ একটা কবিতা দিতে হবে। তুমি নেপাল থেকে কবে ফিরছো?' তাঁর বড়ো ইচ্ছে বাংলাদেশে আসার। সুযোগ হলেই আসবেন। খুব ব্যস্ত ছবি নিয়ে। অভিজিৎদা ইতিমধ্যেই অফিসে ফিরে গেছেন। বাসায় দেখলাম বিরাট এক লাইব্রেরী। দেয়ালে সাটানো কয়েকটি চমৎকার ছবি। পত্রী আর আমি মিনিবাসে শহরের দিকে আসছিলাম। খুব ঘনিষ্ঠ সুরে নানান কথা বললেন। কথা দিয়েছিলাম আবার যাবো। বাসায় ফেরার পথে নিজেকে কেমন একা একা লাগলো।

ঐ দিনই বালিগঞ্জে নির্মল বসাকের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

বিরাট বাড়ি। নির্মলদার বাবা ছিলেন ঢাকেশ্বরী কটন মিলের একজন ডিরেক্টর। তারা মানিকগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন এককালে। বেশ একটা আভিজাত্য ফুটে ওঠে তাদের চলাফেরায়। আমি খাটে বসেছিলাম। নতুন পরিবেশে একটু দমে গেছি। তখনও নির্মলদা অফিস থেকে ফেরেননি। হাত-মুখ ধুয়ে জল-খাবার খেয়ে নিয়েছি। অস্বস্তি তবু কাটছে না। অচেনা এক গন্ধে একটু আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। কখন যে গরাদে চুপিচুপি এসে বসেছে কুয়াশালীন সন্ধ্যা টের পাইনি। তখনও কলকাতায় সাংঘাতিক গরম। শীত আসবো আসবো করছে। আমি তন্ময় হয়ে সেলফে সাজানো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা দেখছিলাম। আমার হুঁশ ছিলোনা— নীরবে কতো সময় কেটে গেছে।

এমনি সময়ে নির্মল বসাক আমার রুমে ঢুকলেন। কতো অনুযোগের নহর বইলো। এককালে তার সংগে আমার সখ্যতা ছিলো অন্যরকম। অথচ এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিও আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। আমরা একাত্ত হয়েছিলাম বেশ নিবিড়-ভাবেই। দশম শ্রেণী পর্যন্ত নির্মলদা এদেশেই ছিলেন। সুতরাং কৈশোরের দীপ্ততাকে কোনোমতেই ভুলতে পারছেন না। কথায় কথায় বললেন, কিশোরগঞ্জে মামার বাড়ির কথা। কতো দুষ্টুমি করেছেন। তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা সৌহার্দতা ছিলো। ঢাকা কীরকম পাল্টেছে, তখন কেমন ছিলো-- ধলেশ্বরী তাকে এখনও প্রবলভাবে টানে ইত্যকার নানান কথা। তার কবিতায়ও ধলেশ্বরী নানাভাবে এসেছে। দীর্ঘক্ষণ বাংলা কবিতার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হলো। রাত হলো গভীর থেকে গভীরতর।

কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। বিছানায় গা এলিয়ে দেয়ার পরও ঘুম আসছে না। প্রিয়জনদের মুখ চলচ্চিত্রের মতো এসে এসে ফিরে যাচ্ছিলো। অনেকক্ষণ ছটফট করে কেটেছে। অনভি-প্রেত জিজ্ঞাসা আমাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। ঘুম আসছেনা। সামনে শাদা দেয়ালে প্রজাপতির পালক ঝাপটানি আর টিকটিকির

আদিম ক্ষুধা-নিবৃত্তির লড়াই। না ঘুম না জাগরণ। এমন বিস্ময়-কর উত্তেজনার মুখোমুখি এর আগে কখনো হয়েছি বলে মনে পড়েনা। অলক্ষ্যে কখন ঘুম আমাকে ছুঁয়ে দিয়েছে বুঝতে পারিনি। শুধু ভোরে শিকের ফাঁক দিয়ে রোদের আঙুল এসে যখন আমার বিছানা নাচাচ্ছিলো, টেরটি পেয়েছি ঠিক তখনই।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি কাছেই। ·গড়িয়াহাট মোড় থেকে সামান্য দূরে। পরদিন ৩০শে অক্টোবর দশটা নাগাদ তাঁর অভিজাত, ঐশ্বর্যমন্ডিত ফ্ল্যাটে দেখা করতে যাই। সংগে ছিলেন সুবলবাবু। নির্মলদার বাড়িতে যে কটা দিন ছিলাম উনি ছায়ার মতো আমাকে আগলে রেখেছেন। আমার সংগে সংগে বিভিন্ন স্থানে গিয়েছেন। ফ্লাটের নামটাও বেশ কাব্যিক। পারিজাত। দশতলায় লিফটে উঠতে উঠতে মনের ভেতরটা গুনগুনিয়ে উঠ-ছিলো। এই সুনীলকে কতোদিন কতো ভঙ্গিতে তাঁর লেখায় কাছে পেয়েছি। বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে সার্টটা গায়ে গলিয়ে এসেই বেতের চেয়ারে বসলেন। কফি খাওয়ালেন। বৌদিকেও দেখলাম বারকয়েক। খুব ব্যস্ত ছিলেন বোধ হয়। বেশ স্মার্টও।

'আমি তোমাকে তুমি করেই বলি, কেমন?' সুনীল গঙ্গো-পাধ্যায়ের এই আন্তরিকতার ছোঁয়াচ আমাকে কিছুটা অস্বাভাবিক করে তুলবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে কি? 'উপকণ্ঠ' দিলাম। নেড়েচেড়ে দেখে প্রশংসা করলেন। খালেদা এদিব চৌধুরীর প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ পড়লেন। শামসুর রাহমান কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলেন। রাহমানের পঞ্চবর্ষ পূর্তি প্রসঙ্গও উঠলো। কিংবা আল মাহমুদ, বেলাল চৌধুরী। আরো অনেকে। তিনি কিছুদিন আগে আমাদের দেশের উষ্ণতা নিয়ে কলকাতায় ফিরেছেন। কি করে এতো শিগগির ভুলে যাবেন আমাদের মাটির গন্ধ? পঞ্চাশের এতো বড়ো কবি, গল্পকার, উপন্যাসিক—কোনো গরিমা দেখিনি। কাছে টানতে জানেন। সুনীলকেতো আর নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার নেই।

সুনীলের লেখা পড়ে কতোদিন ঘুমহীন কেটেছে। একজন

সন্ন্যাস বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ভেতর-মানসে। অন্তরালোক কখনো দুঃখ-বেদনায় বানের জলে ভেসে গেছে। কখনো আবার আলোয় ঝলমল করেছে। সেই সুনীল এখন কতো কাছের। সুনীলের নীরাকে বারবার সুনীলের মতোই ছুঁতে ইচ্ছে করতো—করে। অথচ সুনীলের মুখোমুখি হলে চট করে বোঝা যায়না সুনীল এতো রোমান্টিক, ভেতরে ভেতরে এতো যন্ত্রণা পুষে রেখেছেন। প্রায় শ'খানেক বই বাজারে। কলকাতার কবিরা শুনেছি তাঁর একশ' বই পূর্ণ হলে ব্যাপক সম্বর্ধনা দেয়ার আয়োজন করবে। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের জন্যে গৌরবের ব্যাপার।

যখন কলকাতার অস্থিরতা সুনীলদেরকে তাড়া করে ফিরছে তাঁরা তখন 'কৃত্তিবাস' বার করতেন। দীর্ঘদিন বেরিয়েছিলো। এইতো কিছুদিন আগে বন্ধ হয়ে যায়। 'কৃত্তিবাস' ছিলো তারুণ্যের পত্রিকা। পত্রিকার পাতা ওল্টালেই বেরিয়ে পড়তো তরতরে তাজা তরুণদের কবিতা। বেলাল চৌধুরী এর রক্ত-মাংসের যোগানদার ছিলেন। সম্পাদনাও করেছেন অনেকদিন। কী দোর্দণ্ড প্রতাপে কেটেছে তাঁদের সেইসব দিনগুলো। বেলাল, সুনীল, শক্তি, তারাপদ এঁরা চলতেন কিছুটা অহংকার নিয়েই। 'কৃত্তিবাস' বৃদ্ধের কোঠায় নাম লিখিয়ে পরিশেষে ধুঁকতে ধুঁকতে মারাই গেলো। কৃত্তিবাসের কলকাতায় বেলাল চৌধুরীর শূন্যতা অনেকেই অনুভব করেন। বেলাল ছিলেন সর্বত্রগামী। দীর্ঘ চৌদ্দ বছরতো। কেউ সহজেই ভুলতে পারেননা। সুনীলদার কাছে লেখা চাইলাম। বাসায় আবার যেতে বললেন। বেলাল চৌধুরীকে চিঠি দেবেন। চিঠি দেবেন আরো দু'একজনকে। আমি অশান্ত পুলকতা নিয়ে সেদিন ফিরেছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য নেপাল থেকে কলকাতা আসতে দেরি হওয়ায় আমি কারোর সাথেই আর দেখা করতে পারিনি। ঢাকা ফিরে এসেছি। এ আমার দুঃখের ফেরা।

সেদিন সুবলবাবু, আমি গিয়েছিলাম শিয়ালদাহ ষ্টেশনে। বউবাজার কিংবা তদপার্শ্ববর্তী এলাকা দেখে আমাদের পুরোনো ঢাকার কথা মনে পড়ে গেলো। তবে ওদের দুর্দশা আরো বেশি।

কী ভিড় বাপরে বাপ! পিল পিল করে ছুটছে সব মানুষ। উধর্ব শ্বাসে। দৌড়ুচ্ছে মানুষ—লোকাল ট্রেন ধরবে। যেন জীবন যুদ্ধে নামতে দেরি হলে আর রক্ষে নেই। ভাঙাচুরো দেয়াল। গালভাঙা জীর্ণ সব দালান। অনন্ত দিনের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলো কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে বয়সের ভারে। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম সেই অবক্ষয়ের দীর্ঘশ্বাস। ট্রামের মন্থর গতি আর করুণ ঘড়ঘড় শব্দ আমাকে বিচলিত করেছে। এই সেই বিচিত্র কলকাতা যার শিয়রে ঘুমিয়েছিলাম স্বপ্নে। যাকে ছুঁয়ে দেবার কী অদম্য বাসনা ছিলো আমার। কিন্তু আমার ভেতরে এমন রিনরিনে কষ্ট হচ্ছে কেন! খুব দ্রুত আমরা দুজন ফিরে এসেছিলাম বাসায়। সুবলবাবু একটু অবাক হয়েছিলেন বটে।

গিয়েছিলাম তারাপদ রায়ের বাড়ি। বাড়িতে তালা ঝুলছে। হঠাৎ চুপসে গেলাম। একটা বাচ্চা মেয়ে বললো অপেক্ষা করতে। কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম বৌদি মিনতি রায় আসছেন। দূরে থাকতেই মৃদু মৃদু হাসছিলেন। তাঁদের সংগে আমার টাংগাইলে দেখা হয়েছিলো। স্কুল থেকে ফিরেছেন বললেন। 'চিনতে পেরে-ছেন?' 'ওমা। চিনতে পারবোনা? তা বলো, কেমন আছো?' তারাপদদার কথা জিজ্ঞেস করলাম। ট্যুরে গেছেন জানালেন। তারাপদ রায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলে খুব ব্যস্ত মানুষ। বৌদি শনিবার বিকেলে কিংবা রোববার দুপুরে খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি প্রতিশ্রুতি রাখতে পারিনি। গুমোট গরমে টগবগ করছে কলকাতা। বেলা এগারোটা হবে। অসন্থিও বাড়ছে। এরই মধ্যে একটু বেসামাল ইংগিত ছিলো বাতাসের। বৌদি তাঁদের 'কয়েক-জন' পত্রিকাটি দিলেন। আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। পাশের ব্যালকনিতে প্রতিমার মতো মুখে একটু মুচকি হাসি ঝলকে উঠলো। আমি সত্যি বলতে কি কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। এ অদৃশ্য ইশারা কলকাতায় হর-হামেশাই পাওয়া যায়। অন্ততঃ আমার ভাগ্যে জুটেছে বহুবার। একটা মৌন আমন্ত্রণ আর কী।

বিকেলের দিকে আমরা দু'জন বালিগঞ্জ লেকে বেড়াতে

গিয়েছিলাম। কিচ্ছু ভাল্লাগছিলোনা। ধীরে ধীরে হেঁটে জলের কাছাকাছি পেঁছলাম। যৌবন-প্রাপ্ত মেয়ের মতো ভরাট শরীরের অধিকারিণী এই লেক। জল টলমল করছে। ওকে ছুঁয়ে দেবার জন্যে, ওকে উত্তাল করার জন্যে, ওকে তুমুল উচ্ছলতায় ভরিয়ে দেবার জন্যে বারবার আমাকে ডাকছিলো। আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছিতো আছিই। চোখ ফেরাবার নাম নেই। হা-হয়ে দেখছিলাম। যেন একটা নগ্ন যুবতী শুয়ে আছে। দুদিকে ছড়িয়ে আছে হাত। দু'পা ঈশৎ ফাঁক করে চোখ বুঁজে মৃদু মৃদু হাসছে। আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলামনা। মনে হচ্ছিলো ছুটে যাই। ছুটে গিয়ে বুকে চেপে ধরি। ছুঁয়ে দিই জল। নাহ্ ওর শরীরের পাড় ধরে দ্রুত পালিয়ে বাঁচলাম। শরৎবাবু পার্কের মাঝে এসে একটু আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু শরৎবাবুও কি আমাকে টেরে টেরে দেখছেন ? না অন্য কিছু ? পার্কে দেখলাম দু'একটা গরু ঘোরাফেরা করছে। হাঁ শরৎবাবু, শেষ পর্যন্ত আপনার বুকের উপর অস্পৃশ্য মহোৎসব ?

পরে অন্য একদিন আবার তারাপদ রায়ের বাড়ি গিয়েছিলাম নির্মলদার সংগে। পন্ডিতিয়া রোডে দেখলাম বড়লোকদেরই আড্ডা। বালিগঞ্জের কাছাকাছি তো। অন্ধকার তখন বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। তারাপদদার স্পষ্ট আর আসর জমানো গমগম আওয়াজে আমরা তিরতিরিয়ে উঠলাম। এক ফাঁকে রফিক আজাদের হাত ভাঙা প্রসঙ্গ উঠেছিলো। বৌদি জিজ্ঞেস করলেন---আবু কায়সার, মাহবুব সাদিক কেমন আছেন। তারাপদদা হা-হা করে হেসে উঠলেন কোন কথার উপর যেন। তবে টাংগাইলে যে চঞ্চল আর উচ্ছল তাতাইকে [তারাপদদার ছেলে] দেখেছি, কলকাতায় সেই তাতাইকে খুঁজে পাইনি। তারাপদ রায় পঞ্চাশের অন্যতম উল্লেখ-যোগ্য কবি। সুনীল, শক্তি, তারপদ বলতে কলকাতায় পঞ্চাশ দশককেই বোঝায়। তাছাড়া এঁরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। ওখানে দেখা হয়েছিলো দেবকুমার বসুর সংগে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি হাজরা মোড় থেকে একটু দূরে

প্রতাপাদিত্য রোডে। ঘিঞ্জি গলিতে দু'একটা বাসার ভেতর-পথ দিয়ে যেতে হয়। বেশ পুরোনো হলদেটে বাড়ি। দীর্ঘ সিঁড়ির সীমানা পেরিয়ে আমরা পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের ষ্টাডিরুমে ঢুকলাম। একটু ভিন্ন, একটু মায়াবী পরিবেশ। চারদিকের দেয়ালে ছবি টাংগানো। কোনোটা কবির নিজের, কোনোটা অন্যের। কবি চমৎকার ছবি আঁকেন। শিগগিরই ফাইন আর্টস্ একাডেমীতে একক প্রদর্শনী করার ইচ্ছে আছে। বারবার ছবির দিকে আমার দৃষ্টি চলে যাচ্ছিলো। কবির সংগে মেলাতে চেষ্টা করছি। ছবির ভেতর একজন শিল্পীর মন-মানসিকতাকে টের পাওয়া যায়। কবিকে যেন একটু একটু চিনতে পারছিলাম। একটা ছবিতে বাস্তবের ক্ষতাক্ততা আর স্বপ্নীল মেদুরতার যে অদ্ভুত সমন্বয় ঘটিয়েছেন তা সত্যি জীবন-ঘনিষ্ঠ।

এই একজন কবিকে পেলাম যিনি আর সবার থেকে এক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান। আমাকে তিনি কথার তোড়ে ভাসিয়ে দিয়েছেন। উষ্ণতায় উত্তপ্ত করেছেন। এতো প্রাণবন্ত, এতো হাসি-খুশি, এতো খোলামেলা আর রসিক যে তাঁর বাসায় গিয়ে কেউ না হেসে বসে থাকতে পারবেননা। স্বল্প সময়ের ভেতরেই উনি যেভাবে কাছে টেনে নিয়েছেন তা অকল্পনীয়, আশাতীত। তখন কলকাতাকে আর নিরস মনে হয়নি। বুকে এক উদ্দীপনা আর আশার জলতরঙ্গ বয়ে গেলো। আমাকে ঘিরে বেজে উঠলো মাদল। পবিত্রদা গল্পে মেতে উঠলেন। আড্ডা জমে গেলো বেশ উত্তুঙ্গ হাওয়ায়। তারপর উচ্চাঙ্গ থেকে ক্রমশ আমরা নেমে আসলাম একদম খাদে। সম্পূর্ণ রুমটায় নিস্তব্ধতা নেমে এলো ক্ষণিকের জন্যে। আবার হাসির উৎরোল। ইতিমধ্যে ভেতর থেকে বৌদি চা পাঠিয়ে দিলেন। আরো অন্তরঙ্গ হচ্ছিলো আলাপন।

পটুয়াখালীর আমতলীতে পবিত্রের পিতৃভিটে। বহুদিন ছিলেন বরিশালে। স্মৃতির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বেদনায়, আবেগে নীল হয়ে যাচ্ছিলেন। কেমন বিষাদঘন ছায়া তাঁর মুখে থিরথির কাঁপছিলো। কি করে ভুলবেন? শৈশবের মাটির ঘ্রাণ,

ধানের শীষের মাথা দোলানো, হাওয়ায় কাশফুলের উত্তালতা তাঁকে খুব টানে। নদীর বাঁকে নৌকোয় জল ভাঙতে, কৈশোরের বন্ধুদেরকে খুঁজে জড়িয়ে ধরার সাধ বহুদিনের। পেছনের 'দিনগুলি, রাত-গুলি কেউ ফেলে আসতে পারেনা। জীবনের বহুল জায়গা জুড়ে থাকে। চিরদিন বুকের সংগে লেপ্টে থাকে। শান্ত হতে জানেনা। আসলে কিশোর বয়সে যা মনকে আন্দোলিত করে, স্বপ্নোত্থিত আচ্ছন্নতায় ডুবিয়ে দেয় তা কোনোক্রমেই ভোলা যায়না। দীর্ঘশ্বাসে ঘরটা কেমন ভারী হয়ে উঠলো।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় ষাট দশকের অন্যতম প্রধান কবি। প্রখ্যাত পত্রিকা 'কবিপত্রে'র সম্পাদক। ব্যক্তিগত জীবনে কোনো এক কলেজের অধ্যাপক তিনি। কথায় কথায় শামসুর রাহমানের কথা বললেন। তাঁর কবিতা খুব ভাল্লাগে। আল মাহমুদও খুব প্রিয়। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর কথাও তুললেন। একটা প্রবন্ধের বই সম্পাদনা করছেন সম্প্রতি। এতে একটু ব্যস্ততার ভাব লক্ষ্য করলাম। 'পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা' বেরিয়েছে বেশ আগে। চারটা বই দিলেন চারজনকে দেয়ার জন্যে। মৃদু হাসি তখন তাঁর ঠোঁটে লেগেছিলো। কবি বললেন, 'তুমি আবার আসবেনা আমার বাসায় ? এখানে একদিন খেয়ে যাও।' আমি বরিশালের ছেলে বলে তিনি আমাকে তাঁর কাছের কেউ মনে করে নিয়েছেন। বললেন, 'দেশের কাউকে দেখলে আমি উদ্বেল হয়ে উঠি। সে আমার আত্মার একজন হয়ে যায়। উহ্ কতোদিন আমার দেশ, আমার গ্রাম দেখিনি। এবার সময় করে যাবো। তুমি আমার সংগে থাকবে। আমরা বরিশাল শহরের অলিগলি ঘুরবো। প্রত্যেকটা স্মৃতিকে তুলে আনবো।' আমাকে সরাসরি তুমি সম্বোধন করেছিলেন কোনো ভনিতা না করেই।

কবি আপোষ করতে জানেননা। দীর্ঘদিন ধরে লড়েছেন নিঃসঙ্গ নাবিকের মতো। পবিত্রের কবিতাই বলে দেয় কবি কতো নির্মল, বুদ্ধিদীপ্ত, গম্ভীর আর তীক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন। পাঠককে হৃদয়-ভাঙার দ্বারে, মন ছুঁয়ে দিতে তাঁর কবিতার বেগ পেতে

হয়না। এখানেই পবিত্রের মুন্সিয়ানা, কৃতিত্ব। এক দৃপ্ত মেজাজে পথ করে নিয়েছেন। ভাঙচুর আর আত্মবিশ্লেষণে নানামুখিন পরীক্ষায় মেতে থেকেছেন কবিতায়। পবিত্র 'দীর্ঘ' কবিতার কবি। দীর্ঘতায় যেন তাঁর বোধন, মনন গেঁথে আছে এক অবিশ্বাস্য শৈল্পিক গুণে। 'ইবলিসের আত্মদর্শন' কবিতায় কবি ভাঙছেন কেমন করে দেখুন—'প্রায়শ বুকের মধ্যে ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত প্রলয় পাথর/ধ্বসে পড়ে পুড়ে যায় প্রাচীন পৃথিবী'। ওখানে পরিচয় হয়েছিলো প্রভাত চৌধুরীর সংগে।

রোদ বাড়ছে। খা খা করছে বাড়িগুলো। রোববার। পবিত্রার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা রাখতেই সমস্ত শরীরটা শিরশির করে উঠলো। হাঁটতে হাঁটতে ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গেলাম। এমনিতেই আমার হাঁটার অভ্যাস কম। চারদিকে শুধু জঞ্জাল। ধুলোর আধিপত্য দেখে নাক ছিটকানো ছাড়া কোনো উপায় থাকেনা। কলকাতায় পাতাল রেলের কাজ চলছে পুরোদমে। ফলে কলকাতার অনেক এলাকা জুড়ে অসদ্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করছে। এর মধ্যেই নাক চোখ বুজে কাজ করে যাচ্ছে মানুষ। এছাড়া সবচেয়ে অমানবিক ব্যাপার হলো মানুষের হাতে-টানা রিকশা। গরু কিংবা ঘোড়ার মতো মানুষ টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঐ দু'চাকার যানটি। আমি একবার মাত্র চড়েছিলাম বাধ্য হয়ে। যা দাম তার তিনগুণ ভাড়া দিয়ে তবে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলাম। অথচ কলকাতার মানুষ দিব্যি এতে চড়ে। কোনো মনোবিকার নেই। এইতো হলো কলকাতা।

আমরা ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসুর বাড়ি যাই। 'একক' পত্রিকার সম্পাদক। বেশ প্রবীণ ভদ্রলোক। ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম, ডঃ এনামুল হক, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকীর সংগে তাঁর বহুদিনের জানাশোনা। এঁদের খবরাখবর জানতে চাইলেন। আমাদের ঢাকায় কয়েকবার তিনি এসেছিলেন বললেন। আমার পত্রিকাটি তাঁকে দিলাম। মাসের প্রথম রোববার তাঁর বাসায় কবিতা পাঠের আসর হয়। সংগে ছিলো ধীমান চক্রবর্তী। 'আলাপ' নামে একটা

পত্রিকা বের করে। ছেলেটা ভালো লিখছে। আসরে কবিতা পড়েছিলাম তিনটে। তেমন জমেনি। কয়েকজন মাত্র কবি। কেমন নিষ্প্রভ আর নিরস ছিলো আসর। আমি মেলাতে পারিনি। আবার ট্রাম, বাস আমাকে গ্রাস করে নিলো। আমি কলকাতার ভিড়ে নিজেকে খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম।

কলকাতার সংগে সখ্যতা পাতানোর চেষ্টা কম করিনি। সুবলবাবুর সংগে এখানে-ওখানে ছুটে গেছি। যখন ভাল্লাগতোনা, তার সংগে রাগ করতাম, অবুঝ বালকের মতো ঝগড়া করতাম। কিন্তু সুবলবাবু আমাকে আগলে রাখতেন। হয়তো তিনি আমাকে বুঝতে পেরেছিলেন। নির্মলদার বাড়ি ফিরে কষ্টে বুক চেপে বসে থাকতাম মুহূর্তের পর মুহূর্ত। কলকাতাকে তাই তীব্রভাবে ভালোবাসতে গিয়ে আশাহত হয়েছি।

দেবকুমার বসু 'সময়ানুগ' পত্রিকার সম্পাদক। নিঃসন্দেহে নেতৃস্থানীয় পত্রিকা। দীর্ঘদিন ধরে 'সময়ানুগ' বেরুচ্ছে। একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে কবিতা-আন্দোলনে। দেবকুমার বসু কবিতায় কতোটুকু সফল হয়েছেন তা বলতে পারছিনা। তবে 'সময়ানুগে'র মাধ্যমে এমন কজন কবি সৃষ্টি করেছেন যাঁরা এখন পশ্চিমবঙ্গের কবিতাঙ্গনে খ্যাতির শীর্ষে। 'সময়ানুগ' একটা প্লাটফর্ম। একটা আলাদা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দেবকুমার বসু সারা পশ্চিমবঙ্গে পরিচিত ব্যক্তি। একজন সজ্জন। যাঁর ব্যক্তিত্বের ছায়াতলে অনেকেই আশ্রয় পেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। তাঁর দ্বার সবার জন্যে খোলা। দেবুদার বহুল অবদান অনস্বীকার্য। চতুর্দিকে বই-পত্র-পত্রিকা। অবিন্যস্ত। তিনি একজন প্রকাশকও। টেমার লেনে তাঁর অফিস মানে সময়ানুগের অফিস। এটাই তাঁর বইয়ের প্রকাশনা সংস্থা। এর ফাঁকেই দেবুদাকে দেখলাম বসে বসে দিব্যি চুটিয়ে আড্ডা মারছেন। এক ধূসর ম্লান বিকেলে বড়ো পরিশ্রান্ত হয়ে দেবুদার ওখানে পেঁৗছেছিলাম। অফিস ছুটির পর বাসে যা ভিড় হয়না! মেয়েদের চাপেই নাভিশ্বাস উঠেছিলো সেদিন। নরম মাংসেরও যে এতো শক্তি!

রোদের তেজ কমে এসেছিলো আগেই। যেন যৌবনে ভাটা পড়েছে। কেমন ভৌতিক আর মায়াময় মনে হচ্ছিলো তাঁর ঘরটা। উপরন্তু, লোডশেডিং। কলকাতায় এটা নিত্য সহচর। রাত দশটার পর বাসায় সবাই অপেক্ষা করে থাকে কখন পাড়াটা অন্ধকারের আঁচলে ঢাকা পড়বে। আবার তার আগেও কখনো কখনো হুট করে লাইট চলে যায়। মোমবাতির শিখায় গনগন করে মানুষের ক্রোধ। বিধ্বস্ত, পরাস্ত সৈনিকের মতো বসে থাকতে দেখলাম রবীন সুর-কে। আমার সংগে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পরও কথা বললেননা। বড়ো অদ্ভুত অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। মালিন্য ছিলো প্রকট।

দেবকুমার বসু'র ওখানেই দেখা পেলাম শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। উনি স্বাভাবিক ছিলেননা। তাঁর কবিতার মতোই পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করছিলো। কতো বড়ো কবি কেমন বুড়োটে হয়ে গেছেন। কদিন ধরে নাকি বাড়ি যাচ্ছেননা। শুধু মদ খেয়ে খেয়ে এখানে-সেখানে এলোমেলো পড়ে থাকছেন। কেউ সহজে ঘাটাতে সাহস পাননা। শুনেছি স্বাভাবিক শক্তি নাকি চমৎকার মানুষ। দেবুদা বললেন, খুবই বন্ধুবৎসল। শক্তির এমন কিছু গুণ আছে যা নাকি অনেকের মধ্যেই নেই। দেবুদা পরিচয় করিয়ে দিতেই দাউদকে চিনি কিনা জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, চিনি। হঠাৎ খিস্তি করে উঠলেন। শক্তির মুখ থেকে এমন কিছু শব্দ বেরুলো, শুনে আমি লজ্জায় কুঁকড়ে গেলাম। চোখ মেঝের দিকে। আমার দম আটকে আসছিলো। টলছেন শক্তি। টলতে টলতেই কথা বলছেন। সম্ভবতঃ সংসারে এক ব্যর্থ মানুষ। ঝালমুড়ি এনেছেন দেবুদা। শক্তি খেতে চাচ্ছেন না। সবাইকে বিলোতেই তাঁর আনন্দ। অস্থিরতার প্রতীক যেন তিনি। থেকে থেকে ঢেঁকুর উঠছে। আমি কিছু বলিনি। কেননা শক্তি সুস্থ্য ছিলেননা, 'আল মাহমুদ কেমন আছেন?' হঠাৎ দেবুদার প্রশ্ন। 'ওর কবিতা আমার বড়ো ভালো লাগে। চিঠি লিখতে বলো।' প্রসঙ্গ উঠেছিলো শামসুর রাহমান আর

বেলাল চৌধুরীরও। বেশ কিছুটা বিষন্নতা নিয়েই আমি আর সুবলবাবু সেদিন বাসায় ফিরেছিলাম। শক্তির জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছিলো।

ভেবেছিলাম কবিতা সিংহকে দেখতে যাবো। আয়োজনও প্রায় শেষ। দেবুদা জানালেন তিনি পশ্চিম জার্মানে গেছেন কিছুদিনের জন্যে। স্বপ্নের কবিতা সিংহ, বন্ধুদের কবিতা সিংহকে আর দেখা হলোনা। বলা হলোনা 'কবিতা সিংহ, আপনার দু'চোখ কাকে জানেনা ? অথচ তাকে আপনি হাতে ছুঁয়েছেন।'

যেদিন কলকাতা পৌঁছেছিলাম সেদিনই 'মুক্তমেলা'র আসর থেকে আমরা 'আনন্দ বাজার'-এ গিয়েছিলাম। অভিজিৎ, বৌদি, আবু আতাহার আর আমি। ঝকঝক করছিলো মেঝে। চারদিকটা এক অজানা আভিজাত্যে ভরা। গোটা দালানটাই শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত। একটা পত্রিকা অফিস যে এতো ঐশ্বর্য-মন্ডিত হবে তা কিন্তু আমাদের এ এলাকায় ভাবতে অবাক লাগে বৈকি। ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

শীর্ষেন্দুকে খুজলাম। নেই। শীর্ষেন্দুতো যা লেখে তা বলতে গেলে কবিতার মতো। 'মানবজমিন' একটা দীর্ঘ কবিতা ছাড়া অন্য কিছু কি ? সেই শীর্ষেন্দুকে পেলামনা। ইচ্ছে ছিলো শীর্ষেন্দুর মুখোমুখি হবো। আনন্দ বাগচীও জয়েন করেছেন এখানে অধ্যাপনা ছেড়ে। কতোজন আছেন ! যাঁরা আমাদের কাছের, একান্ত কাছের—লেখায়। নীরেন, সুনীল শক্তি, পূর্ণেন্দু সবাই আনন্দ বাজারে !

আমরা ঘুরছিলাম নিউমার্কেটে। এক মুসলিম হোটেলে মাংস আর নান-রুটি খেলাম। ফুরফুর করে উড়ছিলাম হওয়ায়। আকাশে ছিল চাঁদ। আমরা ইতিহাসের মরচে-পরা পেরেক ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাঁটছিলাম। কখন ঘোর-লাগা-সময়-হাতে বাসে উঠেছি বলতে পারবোনা। পূর্ব্বাশার কাছাকাছি বাস থেকে নামতেই এক ধরনের ভেজা-সুখ এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমরা হাঁটছিলাম।

কলকাতাকে নিয়ে এর বেশি আর কী লিখতে পারি। অবশ্য আরো দু'এক জায়গায় কবিদের সংগে দেখা হয়েছে বৈকি। আমি তাদেরকে কবি মনে করিনা বলেই এখানে টানিনি। কারণ, তেমন তৃপ্ত হতে পারিনি। পারে কি কেউ? 'তৃপ্তি' শব্দটাই তো বড়ো গোলমেলে। আমাকে সমুদ্র উপুড় করে দিলেও কি তৃপ্ত হতে পারবো? এসব তর্কাতীত নয়।

ভাল্লাগছিলো না। আমি ফিরে আসবো। বৌদি বাবার বাড়ি। আমি, অভিজিৎদা দেখতে গিয়েছিলাম। তাকে শেষ-দেখা দেখে এসেছি। রাত্রে অভিজিৎদা নিজহাতে খিচুড়ি পাকাচ্ছিলেন--কথা বলছিলেন কিছুটা নরম সুরে। ফিরে আসছি আমি। একটুতো কষ্ট হবেই ছেড়ে আসতে। বাইরে ঘুমিয়ে আছে কলকাতা। কোনো তাড়াহুড়ো নেই।

বাইরে বাতাসে উড়ছিলো ঝরাগান। মনে পড়লো শক্তি, সুনীলের কবিতা। শক্তি—'দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া/কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া/'অবনী বাড়ি আছো?'...সুনীল—'এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ/আমি কি এ-হাতে কোনো পাপ করতে পারি?' ....কিংবা' বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুনা বলেছিল,/যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে/সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের গন্ধ হবে!' ....এসব কবিতা আমাকে আমার হৃত রুপোলি মুহূর্তগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। হাসানের 'ঝিনুক নীরবে সহো, ঝিনুক নীরবে সহে যাও/ভিতরে বিষের বালি, মুখ বুজে মুক্তা ফলাও' আমাকে আত্মস্থ হতে সাহায্য করে।

কিন্তু এখন, এই গহীন অন্ধকার বিছানায় আমার সকল বাঁধ ভেঙে গেছে। কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ছিলো বিক্ষিপ্ত ব্যাধের তীব্র বিষ। বালিগঞ্জ লেকের যৌবনবতী জলও আমাকে শান্ত করতে পারেনি। কলকাতা আমাকে কাপালিকের মতো তাড়িয়ে বেড়ালো। লেকের নগ্ন শরীর আমাকে কাঁদিয়েছে। তবু আমি ওকে দেখেছি বারবার। ভুলে থেকেছি আমার ঢাকা, আমার মিতুকে,

বাসার সামনেকার ঘাসের আবিলতাকে। ইচ্ছে করছিলো কলকাতার সীমন্তে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে আসি।

আমি একটুও স্বস্তি পাইনি। গতানুগতিক শব্দ-তোরণে, ঘটনাপ্রবাহে হৃদয় ক্ষতাক্ত হয়েছে। আমি প্রায়শই ছুটে যেতাম গড়ের মাঠে। ওর ধু-ধু বিশালতায় হারিয়ে নিজেকে বুঝতে পারতাম। ও আমার দুঃখকে, কষ্টকে মুছে দিতো। গড়ের মাঠে আমি আমাকে ফিরে পেতাম। অন্য কোনোখানে আমার রাঙা ঘোড়াকে ছোটাতে পারতামনা। আমাকে ওর বুকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে রাখতো যতোক্ষণ না আমি স্থির হতাম। ওকে দেখে দেখে, ওর শরীরে হেঁটে হেঁটে আমার আঁশ মিটতোনা।

হাওড়া ব্রিজের ওভালে অবেলার প্রতীক্ষার মতো গঙ্গাও আমাকে ভুগিয়েছে। ভুল স্বপ্ন উঁইপোকায় কেটে কেটে একশা করেছে। মোহের উপরও চুন-ভাঙা দাগ স্পষ্ট। ছোট্টবেলার ডুব-সাঁতারের কথা মনে হতো কেবলি। আমি ঝুরঝুর ভেঙে পড়তাম। আমার ভেতরে গঙ্গার পাড়-ভাঙার শব্দ শুনতে পেতাম। তবু আমি কলকাতার গন্ধে মাতাল হয়েছি। কল্লোলিনী কলকাতাকে ভালোবেসেছি। হারিয়ে দিয়েছি।

... ...

আবিদ আজাদ

মন বলছে রাজশাহী যাই, রাজশাহী যাই

মন বলছে, রাজশাহী যাই, রাজশাহী যাই
কিযে হলো, সকাল থেকেই আজকে আমার দুরাবস্থার হলো শুরু
আহা আমি এমন ভালো কতোদিন যে ছিলাম না এই ভালো থাকায়
মন বলছে, খুব কি আমি সুখে ছিলাম, খুব কি আমি দুখে ছিলাম
এতোদিন এই একলা ঢাকায় ?
তাহলে আজ সকাল থেকেই কেনো আমার এমন হলো ?
কেনো আমি লেপের ভিতর মাথা গুঁজে রাজশাহীকে বুকে নিলাম ?
কেনো নিলাম ?
কেনো আমি উস্কোখুস্কো চিমটি কেটে রাজশাহীকে
ঘুম পাড়ালাম বুকের উপর ? কেনো ? কেনো ?

রাজশাহী কে ? কোথায় ছিলো ? রাজশাহী কি মস্তো কোনো
টিলা-শহর ?
ওখানে কি কুয়াশা খুব ? ওখানে কি সারাগ্রীষ্ম আম্রকানন
গাছের ছায়া ধরে রাখে গাছের ছায়ার আড়ালটুকু ?
রাজশাহী কি ধূসর মাটির বুকের উপর অনেকগুলো বাংলোবাড়ি
রিজার্ভ করে রেখে দিয়েছে আমার জন্যে ?
তাহলে যাই, মন বলছে রাজশাহী যাই, রাজশাহী যাই।
রাজশাহী কে ? কোথায় ছিলো ? কেনো ছিলো ?
রাজশাহী আর রাজেন্দ্রপুর—জানতে আমার ইচ্ছে করে
এই দুটো কি একই শহর ?
এইতো আমি লেপ টেনে যেই মুখে দিলাম
মনে হলো মাদারগাছ আর মাদাগাস্কার—কোথায় যেনো মিল আছে,
তাই

ঘুম ভাঙলো, সকাল হলো, কিন্তু আজ আর পাশ ফেরা যে হয়না
আমার।
লেপের ভিতর হাঁটুর ভিতর
রাজশাহীকে জড়িয়ে নিলাম
এবং আমি ছন্নছাড়া গলায় শুধু বলতে থাকি ঃ
"হু হু হু হুইসিল বাজে, রেলেরগাড়ির বুকের মধ্যে ধোঁয়া উঠছে
ইষ্টিশানের মিষ্টিফুলের বনে কালো পিপঁড়ে উড়ছে—
মন বলছে, রাজশাহী যাই, রাজশাহী যাই।

আহা আমার কিযে হলো, সবাই কেমন বদলে গেলো।
মনে হলো ঢাকার সব ফুটপাথে আর পার্কে যতো বেঞ্চিগুলো,
সবই আমার
রমনামাঠের সবচে' বিজন ফুলটি যখন কাত হয়ে যায়
মনে হলো সেও আমার
আমার আমার সবই আমার।
মনে হচ্ছে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা ঐযে ঝাউগাছটা
সেও যেনো একটুখানি নুয়ে এসে আমার জামার হাতের ভিতর
গন্ধ খুঁজছে !
আমি কি আজ গন্ধ দিচ্ছি সকাল থেকে ?
আহা ! আমার রাজশাহী কি গরদবস্ত্র প্রেজেন্টেশন পাঠিয়ে দিলো
রমনামাঠের গাছগুলোকে পরার জন্যে ?
মনে হচ্ছে আমার জন্যে সবখানে আজ খোলা দোয়ার
এমন কি আজ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে হাড়-হাভাতের ছন্নছাড়া
দলের জন্যে
আকাশভরা ছিন্নভিন্ন মেঘের তাঁবু,
ছড়িয়ে আছে সুব্যবস্থা গাছের পাতায়—
তাইতো আমার মন বলছে, রাজশাহী যাই, রাজশাহী যাই।

রাজশাহী কে ? কোথায় ছিলো ? আমার জন্যে রাজশাহীরও মন

কি আজ কেমন করে ?
রাজশাহী কি ইংরেজীতে অনার্স পড়ে ?
রাজশাহী কি ভালোবাসে, একলা মানুষ ?
না, না, থাকুক, রাজশাহী খুব লাজুক শহর
না হয় আমি একটুখানি দূরেই বসি, একটুখানি সহজ করে আবার
বলি

রাজশাহী তার সুবিখ্যাত আমের জন্যে
রাঢ়-বঙ্গের ইতিহাসে রাজশাহী আজ এইতো প্রথম আমার হলো—
উপঢৌকন, আমের চেয়ে আমার কাছে আম্রপালি
জানিনা কি সামঞ্জস্য খুঁজে পেলাম আজকে হঠাৎ সকাল বেলায়
পাশ ফিরতেই রাজশাহী আজ ডাকলো আমায় লেপের ভিতর
কাঁথার ভিতর—প্রাপ্তবয়স কানামাছির আঁশটে খেলায়
মনে পড়লো, আমার নিজের ঠিকানাটা ঠিকঠিক কি
দিয়েছিলাম সেদিন তার হঠাৎ নুয়ে পড়া কালো চোখে গুঁজে ?
ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ তা না হলে ওকি আমায় লিখতে পারে ?

মন বলছে রাজশাহী যাই, রাজশাহী যাই
রাজশাহী কি খোলামেলা ? ওখানে কি সারাবছর শীতের সিজন ?
এখন কি খুব মেঘমুহূর্ত রাজশাহীতে ?
কিংবা ভীষণ জেদী কালো মেয়ের মতো চুলের ফিতে
বাঁধতে গিয়ে ভীষণ রকম রাগ করেছে রাজশাহী আজ ?
বাঁ হাতে তার আর্শি ধরা ঃ সারাশহর জুড়ে হঠাৎ
বৃষ্টি হয়ে গেছে প্রচুর ?
আমার শুধু ইচ্ছে করছে লাক্সারি কোচ ধরে আমি এক্ষুনি যাই,
একদৌড়ে যাই
গিয়ে বলি, বন্ধ রাখো আজকে তোমার ধর্মঘটের প্রস্তুতি, আর
শ্লোগান মিছিল
দাবী দাওয়া, নন-গেজেটেড তুমুল ধ্বনি, স্থানীয় সুখ-দুখের জন্যে
মিটিং, সভা

রাজশাহী আজ তোমার হাতে দিলাম আমি একটাই কাজ,
ভাবো, ভাবো, আমার কথা ভাবো বসে সারাদুপুর।
আমার শুধু ইচ্ছে করছে, এক্ষুনি যাই, একদৌড়ে যাই
ভীষণরকম ছড়িয়ে দিয়ে আসিগে আজ
রাজশাহীর ঐ চুলগুলিকে
যা নাকি ঠিক এই মুহূর্তে আমার মুখে ছড়িয়ে আছে ?
রাজশাহী আজ আমায় শুধু ডাকছে কাছে।
কেনো ডাকছে ? কেনো ডাকছে পাশ ফিরতেই অন্যপাশে ফেরার জন্যে ?
কেনো ডাকছে ঘুম ভাঙতেই অন্যদিকে ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়তে ?
কেনো ডাকছে ? কেনো ডাকছে ? কেনো ডাকছে ?
আমার চেয়ে নিজের কাছে এমন কি কেউ আজও আছে ?

মন বলছে, রাজশাহী যাই, রাজশাহী যাই।

... ...

আবিদ আজাদ-এর

তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ

বনতরুদের মর্ম

শিগগিরই আপনাদের হাতে পৌঁছবে।

শিহাব সরকার

পিতা

মানুষ মানুষকে খুন করে ক্রোধে
রক্তে হলাহল দাগে রাজ্যলোভ ইন্দ্রিয় সুখ, ক্ষমতার প্রেত
তোমাকে আমি কেন খুন করেছি পিতা ?

আমি সইতে পারিনি তুমি মানুষের অতিরিক্ত কিছু
তোমার মুঠোয় ছিলো সূর্যোস্ফিটক
শতাব্দীর অগ্নিগিরি
কণ্ঠে সমুদ্র কল্লোল,
আমি সইতে পারিনি তুমিই তুলে আনবে মুক্তির লোহিত পদ্ম
অতিক্রম করে যাবে চক্ষুনাশা কাম ক্রোধ লিপ্সাময়
মানুষের সীমা

আমার জন্মে কি দোষ ছিলো ?
হাতে ফুলের নীচে ছুরি ছিলো ?
তুমি বলেছিলে, হে পরাজিত লাঞ্ছিত মানুষ
এসো আমরা গোত্রে গোত্রে কালো শাদায় দ্বীপে উপকূলে
সেতু গড়ে তৈরি করি মহাজীবনের মালা।
মানুষকে তুমি বলেছিলে, মেঘ—শ্যামা পাখি
বলেছিলে ধান শস্য
বলেছিলে, তোমরা আমার ভাই
আমারে ঠাঁই দিও তোমাদের বুকে

পিতা আমি পারিনি
আমি সইতে পারিনি তুমি অতিক্রম ক'রে যাবে
চক্ষুনাশাকামক্রোধ লিপ্সাময় মানুষের সীমা

মানুষ মানুষকে খুন করে ঘৃণায়
খুন করে প্রায়শ্চিত্ত করে
আমার ক্রোধ নেই, ঘৃণা নেই, প্রায়শ্চিত্ত নেই
আমি হতভাগা
তোমার রক্তে রাঙানো হাতে পিণ্ড কুণ্ঠ হোক কণ্ঠ হোক।

তুমিই কি গুপ্তচর তোমার

চৌচির, খান-খান হয়ে যাচ্ছে পরাপ্রকৃতির মাটি
টলে উঠবে সমস্ত স্তম্ভ, তুমি যতো মিনতি করো
তোমার সম্ভ্রম আর থাকবে না
দিন বড়ো অস্থির।
সব কিছু খুব খোলামেলা, জরুরি গদ্যময়—
আর কোনো আবিষ্কার হবে না আপাতত

অনেক বিশ্রাম হয়েছে মানুষের, মধ্যে অসম্ভব ঘুম
স্বপ্ন ছুটে গেছে অন্তিম মোহনার দিকে
আমি বলেছি সন্ধি হোক খরা ও প্লাবনে
বলেছি, ছোট্ট একটা সংসার হোক, শান্তি হোক
সেই থেকে উত্তাপ, শুরু হয় প্রাণঘাতী দ্বিধা
বিরোধেই কি স্বাধীনতা, নিস্ফল রতিক্রিয়া শেষ ক'রে
অবশেষে অভিশাপ তোমাকে ?
ভেঙে-চুরে যেতে আজ আমি সত্যই ভালোবাসি ?

এখন কেউ ঘরে ফেরার কথা তুলছে না
গহ্বরে মুখ বেঁধে ফেলে এসেছি মুখর স্মৃতি
তৈরি হয়েছি দশকে দশকে, মুখোমুখি হবে একদিন
অনেক বিশ্রাম হলো মানুষের, মধ্যে অসম্ভব ঘুম
স্বপ্ন ছুটে গেছে অন্তিম মোহনার দিকে

আমার দিকে আমিই বল্লম তাক ক'রে আছি
তুমিই কি গুপ্তচর তোমার পিছু-পিছু ?

তুমি শান্তা, তুমি লুসিয়ানা

কবিতার অসহায় পান্ডুলিপি মাড়িয়ে
সাহসী যুবতীরা দুদ্দাড় উঠে যাচ্ছে
বিপণী বিতানের চৌতলা পাঁচতলায়
সারা সন্ধ্যা খিলিখিলি হাসি
উড়ছে ছত্রখান পদ্যের চরণ ঢাকার বাতাসে
'তোমারে লক্ষ্য করি, তোমারে লক্ষ্য করি'

এখন প্রতিটি কুমারীর পেছনে ঘুরছে কবিতা
তুমি ধানমন্ডির মেয়ে, নিজেকে জানো খুব সাবলম্বী
সম্রাজ্ঞীর মতো চলে যাচ্ছো
কোনো প্রকার বশ মানবে না
স্বপ্নেও ভাবোনা আজকাল কেউ
তোমার কিছু নিতে পারে
অথচ ঐ দ্যাখো হাহাকার করে আসছে কবিতা
রক্ত চক্ষু, উন্মাদ, চৌচির--

তুমি শান্তা জেসমিন, তুমি লুসিয়ানা
এখন খুব ফুরফুরে শিমুলের মতো
হাওয়ায় জনারণ্যে ভেসে বেড়াও
তোমার কোনো দুঃখ নেই, ব্যর্থতাবোধ নেই
তুমি কাঁদতে একেবারে ভুলে গেছো
একেক মুহূর্তে তোমাকে বড় বেশী খেলো
আর ঠান্ডা মনে হয়
যেনো তুমি কোনোদিন কালিদাসের বা
রবীন্দ্রনাথের নায়িকা ছিলে না
কঙ্কাবতী ছিলে না।

তোমাকে দেখি যোগ্য স্থপতির হাত ধরে
মহৎ শিল্পের দিকে চলে যাচ্ছো

ফিরেও তাকাবেনা !
তুমি আণবিক মেয়ে দ্রুত মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছো
ফিরেও তাকাবেনা !
তোমার যাবার পথে, এয়ারপোর্টে ছটফট করে
লুকিয়ে কাঁদে
রাস্তায় বেহেড মাতাল পড়ে থাকে
ব্যর্থ, স্বপ্নক্লান্ত কবি !

পৃথিবীর ধান ক্ষেতগুলো

পৃথিবী লক্ষ কোটি সেকেণ্ড ঘুরে এসেছে
এর ভেতর ক'বার সূর্যোদয় হলো, ক'বার সূর্যাস্তের মেরুন
তোমার শত্রুকে টেনে নিয়ে গেলো সমুদ্রে
পড়শীতে পড়শীতে যুদ্ধ গেলো, ঝড় ভূমিকম্প প্লেগ ও প্লাবন
কতো দেশ ও দশকী আঁতাত চরিত্র খোয়ালো।
ছোটোখাটো ভুলে !
আমি পিঠে ধানের আটি, চোখে ঠুলী, হাতে কড়া
সেই যে কবে মিসর সীমান্ত পেরিয়ে এসেছি
আজো তোমার শস্যের ভাঁড়ারে পৌঁছুনো হলো না

শুনেছি তোমাদের রাজ্যপাট উঠে গেছে বহুদিন
এখন সামন্ত প্রথা চলে না কোনো দেশে
তুমিও নাকি হিরের অঙ্গুরি মাথার মুকুট খুলে রেখে
এ্যাশফল্ট সড়ক নির্মাণে নেমে গেছো
তোমার পতাকার রং গাঢ় হয়েছে ক্রমশ মানুষের ক্রোধে

মিসর সীমান্ত পেরিয়ে সেই যে আমি বেরিয়ে এসেছি
পিঠে ধানের আঁটি, চোখে ঠুলী, হাতে কড়া
যাবো তোমার শস্যের ভাঁড়রে, ঠিকানা জানি না
'তবু যেতে তো হবে একদিন' এই ভেবে
পৃথিবীর লক্ষ কোটি ভ্রমণের সাথে

একেকটি মুহূর্তের বিরোধিতা ক'রে
আমি সহস্র পর্বত সমুদ্র বনভূমি মনভূমি ক্ষমাহীন ভ্রমি।
আর ঝলমলে ভোর পেরিয়ে একদিন গ্রীস
একদিন ফ্লোরেন্সের যতিহীন উত্থান জন্ম মৃত্যুর ভেতরে
ঢুকে গেছি
আমার পিঠে ধানের আঁটি চোখে ঠুলী হাতে কড়া
আমার সম্মুখে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে বসন্ত পার্বণ
সোনার মঞ্চে উঠে যাচ্ছেন দিব্যজ্যোতি এক নৃপতি
যৌবন ডমরু বাজে দ্রিম দ্রিম
সমতটে কলকল বয়ে যায় নদী ও নারী
পদ্মের সাথে পদ্মের ধরনে ফুটে আছে হারেম কামিনী
মিসর সীমান্ত পেরিয়ে এক নিঃসাড় পূর্ণিমা রাতে
এইসব আঙ্গুর বাগান ময়ূর পরিধি দেখতে আমি

আশ্চর্যরকম পৃথিবী লক্ষ কোটি সেকেন্ড ঘুরে এসেছে
আমি জানাবো না
এ রকমও বদলে যেতে পারে মানুষ
মানুষের চাষবাস, বন্টন পদ্ধতি !
মানুষের ইতিহাস পাল্টে যেতে পারে নদী ও নারীর প্রভাবে !
আমার বয়স এখনো পঁচিশ
মাথায় ধানের আঁটি চোখে ঠুলী হাতে কড়া
সেই কবে মিসর সীমান্ত পেরিয়ে এসেছি !

আজ তোমাকে ডাকতে গিয়ে দেখি
পৃথিবীর ধানক্ষেতগুলো আশ্চর্যরকম মানুষের মন থেকে
উঠে গেছে !

মাহবুব হাসান

আমার স্বপ্ন

(একজন ধার্মিক মেয়ের জন্যে)

মানুষ আজন্ম একটি স্বপ্নের ভিতরে বাস করছে,
মনের গহীন কোণে সে লালন করছে
আর এক স্বপ্নের ভুবন।
একটি কাঠঠোকরা তার কর্কশ ঠোঁটে খুঁড়ে চলে যেমন
জবীনের পথ, যেমন একটি ময়ূর মেঘের স্তরে স্তরে
সাজিয়ে তোলে নিজের পেখম, তেমনি
একটি প্রাকৃতিক গদ্য-স্বপ্ন আমার অন্তর বাহির জুড়ে
হাঁসছানাদের মতো হুটোপুটি করে, আর
দেখতে দেখতে সুনীল আকাশ থেকে
চরকিবাজী খেয়ে
তরুণের দেহের উচ্ছ্বাসে
ঝলসে ওঠে জোৎস্নার মনোরম চাঁদ।

একটি স্পন্দমান টাকুর মতন স্বপ্নাচ্ছন্ন মানুষ চিরকাল
আজন্ম জড়িয়ে থাকে একটি স্বপ্নের সাথে।

যেমন আমরা আছি -
এ শহরের আর দশজন যেমন আছেন,
ছেলেমেয়েসহ স্বামীর সংসার কিংবা সংসার ছাড়াও
তাদের ভালোবাসা আছে আড়তের চালে; আর আছে
ভোরবেলাকার প্রাতঃক্রিয়ার পর দিনমজুরীর মতন
নিউজ পেপারের নোনাসম্বাদ,
শ্রমিকের স্বপ্নিল রূপোলি তংকা
বাদশাহী মোহরের মতো ঝনাৎ করে বেজে ওঠে
বেশ্যার পেটে; দালালের চোরাগুপ্তা ইতিহাস

কবিতার দুই ঠোঁটের ফাঁকে শতাব্দীকাল ধরে থমকে থাকে;
এদিকে বর্ষার পানির মতো দেহের বেড়াজাল ছিঁড়ে
ছুটে আসে হৃদয়ের ব্যথিত উল্লাস।
মানুষ তন্দ্রালু একটি স্বপ্ন বুনে চলে আজীবন:
নারকেল-বীথিঘেরা অরণ্যময় দ্বীপের মতন
তার স্বপ্নকে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় করে
গড়ে তুলতে চায়.
চায় এই কালো আর হঠাৎ লালে পাওয়া মাটির ভিতর থেকে
ভালোবাসার মতন, রক্তবমির মতন গলগল করে
বেরিয়ে আসুক
তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুধানিবারণী তেল.
শোধিত কিংবা অশোধিত যেমনই হোক –চাই,
শুধু চাই সহজ সরল তেলের আড়ত।
আমি চাই ঐ সব অয়েল ফিল্ডের নিরীহ সরল
শ্রমিকের গালচে-ভরে জমে উঠুক
বঙ্গোপসাগরের নোনা ফেনাময় ঘাম, আর
সমুদ্র চিলের চঞ্চুতে জাতীয় পতাকার মতো
পতপত উড়তে থাকুক দূর বন্দরের দিকে নাবিকের চোখ।
একজন নিপুণ কর্মঠ তাঁতির মতো মানুষ
তার স্বপ্নকে বুনতে থাকে, যেমন শীতের
সকালে উল বোনে কিশোরীর রৌদ্রালু হাত, আর
বাড়ির হাঁটুতে বসে দল বেঁধে 'আমপারা' পড়তে পড়তে
ঠোসকা গাছে টুনটুনির মতোই
নিজের জীবনকে তৈরি করতে থাকে.
বাবুইয়ের মতন বুনতে বুনতে নিজেকে রক্তাক্ত করতে থাকে.
তবু স্বপ্ন বুনে ওইসব স্বপ্নের মানুষেরা. আর
এক ফাঁকে রান্না-করা ইলিশের বাসনার মতন
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে চাঁদ.
আহা! ভাঙা চাঁদ!

জ্যোৎস্না-গলা একটি কিশোরীর হাত ছুঁয়ে
একজন কিশোর, একটি ঘন স্বপ্ন থেকে
আর একটি ঘন স্বপ্ন রচনার ফন্দি আঁটে, তারপর
লোম-ওঠা নেড়ী কুকুরের মতো
চুইয়ে পড়ে তার বর্ণনাহীন বিশাল জীবন।

ঠিক এরকম কানামাছি জীবনের ভিতর
চাঁদে-পাওয়া কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে
শুয়ে থাকে মানুষেরা, শুয়ে শুয়ে
স্বপ্ন বোনে,
স্বপ্নের কাটাতারে হৃদয় রক্তাক্ত করে,
রুপালি ইলিশের মতো ছটফট করে, তবু
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা কিংবা আমাদের ঝিনাইদহের
মাঝিদের মতই পচে যাওয়া স্বপ্নের জালগুলিকে
বুনতে থাকে তারা,
ছিঁড়ে যায়,
কিন্তু আবার বুনতে থাকে।

স্বভাবসুলভানুযায়ী ঐসব মাঝিরা আজ আমার স্বজন,
এই আমি
ঝিনাইদহ-পাড়ের একজন ছোট ডানাকানা-কবি,
স্বপ্ন বুনেছিলাম,
স্বপ্নের জাল বুনেছিলাম; জীবনের
গভীর গহীন গাঙে সেই জাল ফেলে ধরতে চেয়েছিলাম
একটি সোনালি-শাড়ি-পরা রুপালি রোহিত;

কিন্তু কেনো?
মানুষের এই লোভ কেনো?

মুজিবুল হক কবীর

মেঘে মেঘে

তুমি যেদিন চলে গেলে
তিনটি শালিক,
প্রাচীন পালক
শ্যাওলা সবুজ আঙিনাটি মরে গেলো।
টবের গোলাপ
ফুটলো না আর ;
হাওয়া এসে শীর্ণ ডালে
মেললো পাখা
তৃষ্ণা ভেবে ঘড়া থেকে
মুলে কিছু জলের নূপুর
বাজিয়ে দিলুম
টবের গোলাপ ফুটলো না আর।
তুমি যেদিন চলে গেলে
সারা আকাশ (যাকে তুমি বলতে শুধু বিহারভূমি)
ঝুঁকে এলো :
বসতবাড়ি শিকড়সমেত
উঠলো কেঁপে
মেঘে মেঘে জ্বললো কতো
হিরণ প্রভা
বৃষ্টি তো নেই, বৃষ্টি তো নেই।

বোধ

বৃক্ষের পতনে
শিকড়ে পড়েছে
টান,

মাটিতে গোপনে
করেছে প্রবেশ
জমাট পাথর।
প্রতিটি শিকড়
বৈদ্যুতিক
তারের মতোন
ক্রিয়াশীল, কার্যকর।
পাথরের বুক ফুঁড়ে
চলে গেছে তারা
নির্বিবাদে
মাটির গভীর এক বোধ থেকে
আরেক বোধের চূড়ান্ত সীমায়।

রজনীগন্ধা

তোমার সমস্ত চুল
খুলে গেলে
দীপান্বিত সন্ধ্যা আসে;
পাখিরা ঘরের অভিমুখী হয়।
অবসাদে ম্রিয়মান,
ম্লান পাখিদের
চোখের গভীরে ঘুম,
শাদা কাঁশ ফুল ঝরে।
তোমার সমস্ত চুল
খুলে গেলে
ফোটেনা বকুল শুধু,
শুধু প্রেম,
আমার রজনীগন্ধা।

জাহাঙ্গীর ফিরোজ

চিতা

একটি চিতা বদ্ধমাতাল রোদে
চিত্রিত এক হরিণ খুঁজে ফেরে
একটি চিতা মৃগনাভির ঘ্রাণে

নিদ্রা ভুলে জনারণ্যে ঘোরে,
একটি চিতা ক্রুর-কপিশ নোখে
উল্টেপড়া জেব্রা-শরীর খোঁড়ে

একটি চিতা ঢাকার বুকে একা
প্রার্থিত এক হরিণ খুঁজে ফেরে,
একটি চিতা ঢাকায় এখন একা
হয়নি যে তার বিশেষ হরিণ দেখা।

একটি চিতা বদ্ধমাতাল রোদে
চিত্রিত এক হরিণ খুঁজে ফেরে।

ইলিশ-পাখি

উলুক ঝুলুক মধ্যরাতে ডিগবাজি খাই
ভাললাগেনা ভালোবাসা মায়াকান্না ঘরকন্না
এসব থেকে মুক্তি পেতে
জলের ভেতর মাছের ভেতর যাচ্ছি ঢুকে
ভূ-গোল থেকে ভুল গোলকে গোলক ধাঁধাঁয় ঃ
মৎস্যকুমার চোখের ভেতর লুকিয়ে রাখি ইলিশ-কান্না।
তোমার জন্য পাঠাই বার্তা
ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হ'লে
ঝাঁক বেঁধে যায় ইলিশ-পাখি তোমার গৃহে।
গোলক ধাঁধাঁয় ডিগবাজি খায় ধীবরবধূ,
ইলিশ-পাখি ! ঠোঁট থেকে যার পড়ছে ঝরে

বিন্দুসাগর মুক্তোমায়া ঝিনুক-ফড়িং।

উলুক ঝুলুক ডিগবাজি খাই
মধ্যরাতে মাকড় কন্যা
তন্তুতে যার রূপের কণা অহংদীপ্ত অর্থগন্ধা
বন্দী করে ছন্নছাড়া কাজল-ফড়িং।
কাজল-ফড়িং বন্দী এখন
ডিগবাজি খাই চিৎবাজি খাই
শেষ অবধি পাঠাই খুলে দুইটি পাখি
ভ্রূ-মুক্ত
তোমার ঘরে যাচ্ছে উড়ে ইলিশ-পাখি।

নিষিদ্ধ শব্দ জাগরণ

নিষিদ্ধ ধুয়োর সাথে মগজের কোষে কোষে গেঁথে থাকে
দূরবর্তী মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি
ঢং ঢং বাজে, বাজতে থাকে
শেষ নেই
তড়িৎ শব্দ কম্পনে জেগে ওঠে মাংসলোভী কালো বেড়ালের চোখ
চোখের ভেতর ক্ষুধা—উফ্ এরকম ক্ষুধা!
মসজিদের গম্বুজ দেখে মনে পড়ে স্পর্শাতীত তার স্তন।
শব্দহীন বেড়ালের পা
পা-য় পা-য় বেড়াল গতিতে
অতিক্রম করে আসে ক'একটি হার্ডল;
মৃদু টোকা—
গলার ভেতর থেকে ঘর্ঘর্ শ্লেষ্মা কেটে 'বেলিফুল'
উচ্চারিত হ'তে না হ'তেই
বসন্তবাতাস এসে খুলে দেয় গাছের শরীর।
ঢং ঢং ঘন্টাধ্বনি
কাঁপতে কাঁপতে
মিশে যায় কাসার ঘন্টায়।
রাত্রি শেষ
মসজিদের গম্বুজ থেকে উড়ে যায় সহস্র কপোত।

মাহবুব কামরান

আমাদের চোখের জল

এ চোখে যে অন্যায় দেখেছি, তার শাস্তি একদিন
তোমাদের নিতে হবে।

আমাদের চোখের জল নিঘু‌ম রক্তের বিছানায়
টপটপ ঝরছে নিসর্গের আবেগের সুরে
শিশুর মতো ভুলে যায়;
এ শরীর পূর্ণ হয়েছে কার জন্যে, তার
শাস্তি একদিন তোমাদের নিতে হবে।

যাকে বিপথে যেতে দাওনি, যাকে দর্পণের
খেলায় নির্ভার রেখে গেছো
যার হৃদয় দুঃখের আদর্শ সংবৃত করেছো
তার বিনিদ্র যৌবন আজও শান্ত; তার
শাস্তি একদিন তোমাদের নিতে হবে।
এ চোখে জ্বলে ওঠেনা প্রতিশোধ, নিতে পারেনা
প্রতিহিংসা, হিম-শীতল-ঠান্ডা বরফ
জমে যায়,
ধীরে ধীরে ধীরে।

ক্যানভাস

তোমাকে ক্যানভাসে আঁকবো বলে, কপাটের ভাঁজে চেয়ে থাকি,
আকাশে মেঘেরা করেনা খেলা
শঙ্খের সন্ধ্যা নেমেছে বাঁশবনে
বানকুরালি উঠেছে নিখুঁত চোরা অন্ধকারে—
আমার ক্যানভাসে এখন বেপরোয়া ছবি
নক্সিকাথার শাড়ী পড়ে স্থির চেয়ে আছে

এই রকম দৃশ্য-চোখের কর্নিয়া ভেঙ্গে—
হঠাৎ শিলা বৃষ্টির ছাট, নিয়ম অমান্য করে
পথের চিহ্ন হয়ে থাকে।

আমি ক্যানভাসে একটি ফুলের সন্ধানে
মেঘের বাগানে সটান পড়ে থাকি,
মেঘ জানে এই রং শব্দের তুলি হয়ে
চোখের কুসুমের ভিতর লালন-পালন করে সংসারে,
নিটোল একগুচ্ছ সকাল অহরহ
ক্যানভাসে ভেসে ওঠে আমার পরিপূর্ণ শিল্পের পাঁজরে।

মিছিল

সবাইকে চিনে ফেলেছি; এক এক করে সবাই আসে
মধ্যঘরের দরোজা এখন বন্ধ
আমরা প্রায়শ্চিত্ত করে এসেছি
সদ্য জন্ম দেবো নতুন সন্তান
প্রিয়া, তোমাকে ভালোবাসা শিখাবো
প্রিয়া, তোমাকে রাজনীতি শিখাবো
প্রিয়া, তোমাকে যুদ্ধ শিখাবো
যেন তুমি লড়তে পারো কাংখিত মানুষের মিছিলে।

... ...

নাসিমা সুলতানা

চন্দ্রালোকিত ট্রেন

মা তোমার জন্মদিনের পাথর রক্তে পুষেছি বলে
আজো কি ফুসফুসে পেরেক   ভীষণ পরাগ লিপ্ত করে রাখে
পিতা ও প্রপিতার সূর্যমুখী ত্রিশূল—এই হরিণ বাসনা.
ক'বার অবিনশ্বরতার মর্মমূলে পৌঁছেছিলে তুমি মা
ক'টি করবীগাছ পুঁতেছিলে আত্মায় ?
সেই থেকে এক চন্দ্রালোকিত ট্রেন ভূমিষ্ট হল আমার
ভয়াল জাগরণ জুড়ে।
আমি কি দ্বিধান্বিত হবো ? আমার সাজানো ফুসফুস
খুলে খুলে পড়ে থাকে এক বিশাল বাগানে
এইভাবে একদিন একটি ট্রেনের কবিতা লিখবো ভেবে
বিক্ষত করি মগজ
এইভাবে একদিন আমার সমস্ত জাগরণ জুড়ে
ভূমিষ্ট হতে থাকে এক বিপুল ইস্পাত-অভিমান
নিওরোটিক যন্ত্রণার ভেতর ঠেলে ঠেলে সেই
চন্দ্রালোকিত ট্রেন উঠে আসে এক জলরঙ
ব্রীজের মাথায়।

আমি যাবো, আমিও যাবো. যেমন কয়েকজন ছন্নছাড়া
লোক হেসে হেসে চলে যায় অসম্ভব শীত ও কুয়াশা পার
হয়ে কোন নিম্ন উপত্যকায়
এই চন্দ্রালোকিত ট্রেনও যেতে থাকবে তেমনি......
ইংলস্ ক্রাগের বিখ্যাত সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের প্রতি
অবিশ্বাস ও পরাজয়ের অগ্নিবুকে, বন্ধুরা এসে মেলাবে
হাত—শুভরাত্রি শুভরাত্রি
তারপর আমাদের পদশব্দ বেয়ে নেমে আসবে
আমাদের সন্দেহ

ক'বার অবিনশ্বরতার মর্মমূলে পৌঁছেছিলে তুমি মা
ক'টি করবীগাছ পুঁতেছিলে আত্মায় ?
প্রস্রাবের বেদনার মতো নীলচে নকশা কাঁথায় এখনো ভূমিষ্ঠ
হয় আমাদের ইস্পাত-আকাংখা --
নিওরোটিক যন্ত্রণার ভেতরে ঠেলে ঠেলে সেই
চন্দ্রালোকিত ট্রেন উঠে আসে এক জলরঙ
ব্রীজের মাথায়।

শীর্ষে যাবো

শৈশবে বুড়ি ছোঁয়া খেলায় কোনদিন মাকে ছুঁতে গিয়ে
মনে হয়েছিল কবে বড় হবো, কবে খোলা দরজার বাইরে
হাওয়ায় উড়িয়ে দেবো আমার নিশান -
সেই থেকে পাহাড়বন্দী আমি
পৃথিবীর একভাগ স্থল জুড়ে কেবলই পাহাড়
পায়ের নীচে এতটুকু জলও নেই, জলাঘাত......জলোচ্ছ্বাস......
অন্ততঃ বেহালার মত অভাবিত জলাঘাতে হয়তো পারতাম যেতে
ইন্দ্রের সভায়।
অথচ এখন চড়াই-উৎরাই, বালি ও পাথর, ফোস্কা ও ঘা
সর্প-শীতলতা পদে পদে......
যেতে চাই চূড়ান্ত শীর্ষে, শীর্ষলাভ ঘটেনা আমার।

শৈশবে বুড়ি ছোঁয়া খেলায় মাকে ছুঁতে গিয়ে কোনদিন
মনে হয়েছিল কবে বড় হবো
সেই থেকে পাহাড়বন্দী আমি
পাহাড়কে ডেকে বলি ওপরে যাবো
ওপরে যাওয়ার ইচ্ছেয়......যেতে যেতে আমার শরীরে ঢুকে পড়ে
ব্যাণ্ডেজ তুলো
জটিল অসুখেরা
আদিগন্ত শূন্যে মিলিয়ে যায় পঞ্চভূত দেহ
মাথা নুয়ে পড়ে, ঝুলে পড়ে বাহু, মনে হয় মাকে ছুঁতে পারিনি
পারিনি

এমনই পরাস্ত পরাজিত।
বিলীন মেঘের নীচে ধোয়াটে চাঁদের মতো ঝুঁকে পড়ে হাঁটে
—যেন অচেনা মানুষ
আহা ক্লান্তি ও দুরারোগ্য ব্যাধি !
মনে হয় শুয়ে পড়ি শৈশবের মৃতের কাঁথায়
মাকে ডেকে বলি মা আমি ওপরে যাবো
ঈশ্বরের রাজ্য থেকে কোন প্রত্যুত্তর আসেনা আসেনা

আলু-পটল-কুমড়ো বিষয়ক

মশাই কি এইপথে বহুদিন……
মেটামরফসিসে অব্যর্থ গলে গিয়ে জীবন বিপ্লব
চায়ের কাপে এক চুমুক সশস্ত্র সংগ্রাম
মশাই কি ভয়ংকর উচ্ছন্ন খরা……ফসফরাসের মুখখোলা
অভিমান থেকে
পিতার সিফিলিস অমান্য করে
নিরীহ পায়রার খোপে ভুলছুট ?

বেশতো দেখালেন চাঁদের ভেতর রুটি এবং রুটির ভেতরে চাঁদ
আর দ্বাদশ মনুমেন্টের নীচে রক্তবমন ; মদ মাংস, অশ্রুপাত
আমি এতেই উগড়ে দিয়েছি আমার আত্মবিস্মরণ
ঠান্ডা বালিতে শুইয়ে এসেছি সমূহ ক্রোধ ও বিনয়।

মশাই কি ক্যাসিয়াসের দাঁড়ঘেরা আস্ফালন……প্রাগৈতিহাসিক
শূন্যতায় ভর করে শেষতম টাকাটি ছুঁড়ে দিলেন আলু-পটল ও
কুমড়োর পায়ে !

বেশতো শোনালেন এক নির্বাসিত রাজ্যের কবিতা
আর এক ঘাতকের গঙ্গায় আচমন সেরে পুজোয় বসার গল্প

আমি এতেই আমার জাগরণের শকুনচক্ষু পাখিটিকে বিদ্ধ করেছি
নখে

আর তিনবন্ধ, সেবদ-রক্তে হিংসাত্মক ছিটকে গেছে কাটা চামচের অস্ত্র —
আপনিতো বলেছেন চায়ের কাপে এক চমৎকার সশস্ত্র সংগ্রাম, আর
হাসতে হাসতে মেটামরফসিসে অব্যর্থ গলে যাওয়া কবিতা
আমি সেই থেকে ঋণী আছি।

মশাই আমাকে চিনবেননা

বহুদিন এইভাবে

বহুদিন এইভাবে দুঃখ করতে করতে গেল
বহুদিন এইভাবে ব্যর্থতার কবিতা লিখতে লিখতে
বহুদিন এইভাবে বুড়ো শেয়ালের মত লাফিয়ে লাফিয়ে
গেল......বহুদিন

পৃথিবীতে যত সমতল ভূমি আছে সব কি লাঙলের ফলায়
তুলে দেয় অসফল চাষ ?
পৃথিবীতে যত জলভাগ আছে সব কি অক্টোপাস, হাঙ্গরের দাঁতে
খুলে দেয় আদিম ভাসান ?
বহুদিন এইভাবে ঘটে গেল বসন্তে ঝড় ও প্লাবন
বহুদিন এইভাবে বসন্তহীন থেকে গেল সময়ের
মুঠোভর্তি ফুল।

মাঝে মধ্যে দু'একজন কম্যুনিষ্ট বারোয়ারি গলায়
বলেছে—আমূল পরিবর্তন চাই, চাই নতুন মানুষ
মাঝে মধ্যে দু'একজন উড়োমার্কা ছেলে খালি পায়ে
চলে গেছে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে
মাঝে মধ্যে দু'একজন কবি চায়ের আড্ডায় বসে
লিখেছে আলু-পটল কুমড়ো বিষয়ক তুখোড় কবিতা......

বহুদিন এইভাবে বিপ্লবের কথা শুনে, তুখোড় কবিতা
পড়ে গেল
বহুদিন এইভাবে পায়ের তলায় মাটিহীন গেল।

রমেশ রায়

অহংকার

আমার ভেতরে প্রায়শই খেলা করে অহংকারী নদী
আমার বুকের মধ্যে তারই আজ ক্রুদ্ধ তোলপাড়
যেন পাহাড়-ভাসা প্রতিজ্ঞা ক্রমশ ধেয়ে উঠছে
যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ফুঁড়ে সূর্যকেও
বলের মতো এনে ছুঁড়ে ফেলবে
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে

কখনোবা আমার ভেতর সেই বিশাল নদী গর্জন করে ওঠে
সামুদ্রিক ঝড়ে
যেন নিমেষেই গুঁড়িয়ে ফেলবে সে ভন্ড মাতালের বিষদাঁত
আমার বুকের ভেতর প্রায়শই গেঁথে যাচ্ছে
যৌবনের অনন্ত ক্রোধ
বেড়ে উঠছে বিশাল বৃক্ষে
যেমন ছোট চারাগাছ
বেড়ে ওঠে বিশাল অরণ্যবাহে

ইদানিং হঠাৎ করেই যেন আমার ভেতরে জেগে উঠছে নদী
নদীর প্রবাল প্রভাব-সংগ পলির অনন্ত মমত্ব
গড়ে উঠছে বসতির ভূভাগে উছলে পড়ার এক খন্ড আনন্দ
অহংকার

... ...

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

আলীফ থেকে আবাবিল

একটি বেদনার্ত পাখি ক্লান্ত পাখায় নরম জোছনার স্পর্শ সরিয়ে
সরিয়ে

আস্তে উড়ে যায় রাত্রির ওপারে
যেখানে পৃথিবী নেই, পাখি নেই……
ফিল্মের ফোকাশের মতো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আহ্নিক
যেখানে কোনো জীবন নেই।

একজন যাযাবর যুবক সেখানে নিজেকে খুলে খুলে দেখে
কোথায় কোন পাঁজরের পিছনে পালিয়ে থাকে অন্য মানুষ
প্রেসের কম্পোজিটর যেমন বুকের ভেতর থেকে বর্ণমালা বের করে
সাজায় শব্দ, সংকলন।

নিরিবিলি নির্জনে খুলে খুলে ছুঁয়ে দেখে জ্যাঁ পল সার্ত্রের
অস্তিত্ববাদ

হাতের ছোঁয়া পেয়েই চমকে ওঠে এতোদিনের সঞ্চিত গুটানো কষ্ট
লিটমাসের মতো লাল নীল হয়ে যায়।

পচা পাতা, ময়লা মাটি, স্যাঁত-স্যাঁতে কচুক্ষেতে কেঁচো যেমন
কিলবিল করে

ঠিক তেমনি অস্তিত্বে জমেথাকা অবহেলা অভিমানের ভেতর থেকে
বেরিয়ে আসে—
মশা মাছি পোকা পাখি বিচ্ছু কীট কষ্ট
কাঁকড়া কাছিম আরশোলা ইঁদুর ছোটসাপ
ঘুণে খাওয়া মানুষ ঘসে ঘসে বাসি ফুলের মতো পায়ের কাছে
পড়ে থাকে একুশটি পাঁপড়ি।

আরব্যোপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসে দীর্ঘ দাঁতাল দানব
ললাটে চুন-কালিতে চাঁদতারার মতো চিহ্ন : ও'

বেসামাল যুবক তখন যন্ত্রণা চেপে ধরে ছুটে পালায় শৈশবের দিকে
দ্রুত দৌড়ে যায়—হাত থেকে হঠাৎ কি যেনো কি পড়ে যায় পিছনে
তবু যুবক ভোঁ-দৌড় দৌড়াতে থাকে
পৃথিবীর কাছাকাছি এসে দোয়া-দরুদ স্মরণ করে পিছনের দিকে
ছুঁড়ে মারে আল্লাহ-রসুলের কসম, কিরা।

তৃষ্ণার্ত যুবা দু'হাতে তুলে নেয় জল, জলটুকু মুখে দিতেই
সাথে সাথে অনেকগুলো পাথর ; খুলে পড়ে দাঁত। তারপর তবু
চিবিয়ে খায় একগুচ্ছ আলপিন
যাবতীয় যন্ত্রণা, নিষ্ঠুর কষ্ট ক্লান্তি
একটা অগ্নিকুন্ডের মতো থকথকে ঘা
কিনকিন করে ওঠে উত্তর অলিন্দে
ট্রাক-ড্রাইভার যেমন এক্সিডেন্টের এক সেকেন্ড পূর্বে হারায় নিয়ন্ত্রণ
নিজস্ব হিয়া—তেমনি যুবকও হারায় তার হাজার বছরের জীবন
অভিমান-অভিযোগ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ছুঁড়ে দেয় ডাস্টবিনে
ঘৃণায়-ঘৃণায় যুবক তখন ঘাতকের মতো হিংস্র
ঘৃণায়-ঘৃণায় যুবক তখন তুলে খায় নিজের চোখ
হাতের আঙুল চিবিয়ে খায় নিজের জিহ্বা।
যুবক একদিন যীশুর মতো সুস্থ ছিলো, সহজ-সরল-সুন্দর ছিমছাম
কবিতার মতো স্পর্শকাতর, আবেগ ছিলো জলের মতো স্বচ্ছ
ঠিক যেনো একজন মানুষ
চিঠি লিখতো মৈমনসিং, মিরপুর, চাটগাঁ, চর খার চর
ঝরা বকুলের মতো ভুল কুড়িয়ে কাটলো সময়
নদীর মতো তোলপাড় করে তার দুঃখভরা বুক। সে এখন
আত্মহননের মর্মে মর্মে প্রিয়স্বজনের প্রোথিত শিকড় তোলে
বুকে ব্যথা লাগে, শিকড় তোলার ব্যথা
তখন বিনা নোটিশে বৃষ্টি আসে—

বৃষ্টিতে একা একা বৃক্ষের মতো ভিজতে থাকে সুন্দর
তারপর আকাশ চুষে নেয় জল
পাখি তুলে খায় পতন।
ব্লোটিং পেপারের মতো সেও তুলে নেয় নিজস্ব মানুষের উপসর্গ
অপ্রেম রাবার দিয়ে ঘষে ঘষে তেঁতুলের বীজের ক্ষতি
কোথায় বিশ্বাস আছে ? ঘুম নেই, কেউ নেই...
রক্তপাত, রাজনীতি, অত্যাচার, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ, মিথ্যে মেহদি
...হায় আঘাত হানলো কাবার পবিত্র পাথরে
পৃথিবীতে কোথায় আছে সত্য ?
ট্যুরিষ্টরা বন্ধুত্বের পতাকা তুলে বন্দরে ফেলে নোঙর
চালে ষড়যন্ত্রের গুটি, লুটে নিয়ে চলে যায় অচিন চাঁদের দেশে
তবু বোঝেনা মানুষ সুন্দর-সাপ কিভাবে খেয়ে যায় চমৎকার মৃত্যু।

একজন দুঃখী মানুষ সামান্য সুখের জন্যে নিজের বুক থেকে
ছিঁড়ে দিলো হৃদয়
তবু অবহেলা (একি পুতুল খেলা ?)
ঘাতকেরা বোঝেনা মৃত্যুর মর্ম
ঘাতকেরা বোঝেনা যন্ত্রণা জ্বালা
তিলে তিলে পোড়ে তুষ
এ কার দোষ !
ক্রেতা-বিক্রেতার মতো ভালবাসা, টিকটিকির লেজের মতো স্বজন
চুল গুছালেই হয়না বেণী, শব্দ সাজালেই হয়না কবিতা
হাত-পা-চোখ-মুখ থাকলেই হয়না মানুষ।

চব্বিশ পরগণা থেকে ঝুনুর পাঠানো চুলচেরা ভালেবোসা
দুধের বাটির মতো জোর করে কেড়ে নিয়েছিলো প্রথম ঘাতক
সেই প্রিয় ঘাতকের কাছে জমা ছিলো যুবকের জীবন বীমা
আজ ছলনার ছুরি দিয়ে কুচি কুচি কাটে
ঘাতক বোঝেনা কিছুই. কিছুই বোঝেনা—
দ্বিতীয় ঘাতক গান শুনে শুনে ঘুমিয়ে পড়ে তার রাতের ভেতর

তৃতীয় ঘাতকের শরীরে বরফের মতো জমে থাকে লোনা অভিমান।

জনৈক ডাক্তার যুবকের উজ্জ্বল স্নায়ু হৃদপিন্ড টেস্ট করতে গিয়ে
দৌড়ে জানালার শিক ধরে হু হু করে কেঁদে উঠে বলেছিলো :
মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে
নিউটনের তিন সূত্রে
যুবক, তুমি বেঁচে আছো আশ্চর্যভাবে।

যুবক এখন পৃথিবীর কাছাকাছি। আবার কি ফিরে যাবে ঘরে ?
না-না-না ওখানে বিশ্বাস নেই, ভালোবাসা নেই, সহোদরা নেই
ঘুম নেই, কেউ নেই...
রক্তাক্ত রাজনীতি ভুল বিকাশের ফুল ফুটে থাকে
চিরদিন প্রিয় তিন ত্রিভুজে বন্দী যুবক। ভালো নেই বুধবার
জ্যোতিষের জ্যামিতি থেকে মিথুন রাশির আহত অসুস্থ যুবক
ঘাতকের চোখে শিশিরের শব্দ
তবু যুবক পৃথিবীর প্রতি থুথু দিয়ে দ্রুত আবার হাঁটতে থাকে
পৃথিবীর উল্টো দিকে—
কিছুদূর যেতেই সামনে সমুদ্র, হিংস্র-হাঙর, পিছনে মৃত্যু
ডাইনে দাউ-দাউ দোজখ-দুঃখ, সুন্দর সাপ আর অজস্র বিচ্ছু
যুবক ঝাঁপিয়ে পড়লো বামে, বামে ছিলো ফণিমসার এক
বিশাল বাগান
তার শরীরে এখন কোটি-কোটি কাঁটা
চোখে কাঁটা, মুখে কাঁটা, কন্ট
মাতালের মতো হাঁটতে থাকে মৃত্যুর দিকে, দারুণ তৃষ্ণাকাতর
জবাই করা মোরগের মতো
যন্ত্রণাবিদ্ধ অস্থির যুবক ছটফট করে পড়ে থাকে স্থির, স্থবির।

বাহান্ন তাসের পর তিনজন ঘাতকের হাতে ফুল, চোখে জল
যুবক তখন ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খায় অমল জলে ; চমৎকার মৃত্যু।

হাত বাড়িয়ে আছি

আগামী নদীর অপেক্ষায় সোহাগে সাগর যেমন দু'হাত বাড়িয়ে
আঙিনায় আঁচল বিছিয়ে রাখে
প্রবাসী স্বামীর প্রতীক্ষায় নারী যেমন—
মধ্যরাতে আড়মোড় শরীর ভেঙে তোলে ক্লান্তির হাই
সময়ের অপেক্ষায়… স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে যাত্রী
সময়ের অপেক্ষায়… টার্মিনালে মানুষের ভীড়
নারী নিজের গর্ভে মায়োসিস বিভাজনে তৈরি করে ভ্রূণ
আর পঞ্জিকার পাতায় গোণে চান্দ্রমাস
উত্তরের অপেক্ষায় পিয়নের পথচে' জানালায় দাঁড়িয়ে
থাকার মতো কিশোরী পড়ে শাড়ি
কৃষ্ণচূড়ার ভেতর প্রস্তুতি চলে দ্রুত
ফেব্রুয়ারী ফাল্গুণ এসে গেছে তাই পাতার আড়ালে বাড়ে
গোপন গোলাপ-গ্লানি
শিল্পের তৃষ্ণা নিয়ে নিজেকে জ্বালিয়ে রাখে জীবন
থকথকে বুকের ভেতর পুষে রাখে তুষের দহন, দুঃখ
রাত-ভরা বৃষ্টি আর আষাঢ়ের আশা অপেক্ষায় থাকে
কদম কলি
ইস্রাফিল যেমন হুকুমের অপেক্ষায় থেকে ঘুমিয়ে গেছে
তন্দ্রায় গনি মিঞা আসন্ন নবান্নের স্বপ্ন নিয়ে
হাতের মুঠোয় মাটির ঢিলার মতো ভাঙে সখিনার বুক
পরীক্ষার পর যেমন ফলাফলের প্রতীক্ষায় কাটে ছুটি
রাতের শেষ-প্রহর যেমন ডলপেটে ধরে রাখে ভোর
আশ্বিনের শেষে কার্তিক
কার্তিকের বুক থেকে হেমন্ত ;
আমি হাত বাড়িয়ে আছি…

নাঈম হাসান

দেয়াল

কী অদ্ভুত পিপাসার মধ্যে দিন কাটে
সোনাগাছা চুড়ি, হীরের টুকরো পড়ে থাকে দু-ই
মাটির সন্তান আমি কেবলই তৃষ্ণায় ভুগি

হেরেমের খোলা দরজার মুখে অস্ত যায় আলো
একটি মুখ প্যাগডার মতো চুড়ো হয়ে বসে থাকে
আমার পিপাসা তার কাছে কিছু রেখে আসা যেতো
কিন্তু পাখি সেখান থেকেও
হঠাৎ উধাও

দিনে দিনে দূরে চলে গেছে সব
নাখাল পাড়ার মেয়েরা ভরাট করেনি কলস
কলতলা থেকে আসেনি জলের গড়ানো শব্দ
আমার ভেতর সমুদ্র জেগে আর
শীতল পাটিতে শুইয়ে রেখেছি দেহ
সাঁতরে দেখেছি, সারাটা দুপুর, খোলা হয়ে ছিলো
বিষম হাওয়ায় মেলেছি চোখের তারা
খোয়ানো হৃদয় পেয়েছে খানিক সাড়া
তোমরা পাশেই তুলে দিয়ে গেলে
কী এক দেয়াল ? আমি বুঝিনা তো !

পাথরের শোক

হে প্রেম, উৎকর্ণ লতা উঠোনে এখনো
ছড়িয়ে পশুর রক্ত, আমাদের যুবরাজ তার
শিরস্ত্রাণ ফেলে রেখে কোথায় গেলেন !
আহত মোরগ ওই কণ্ঠ তার ভার হ'য়ে আছে
কবাটগুলো সলতেহীনা প্রদীপের মতো

উদাসীন মৌনতায় হা হা
শরতের ভোর দুই হাঁটু ভেঙে নত
মিতুর বুকের স্বপ্ন-শিশু কই ধুলোয় গড়ালো

আমাকে কি করতে বলো, শান্তি
আমাকে কি করতে বলো ? কস্তুরী সুখের সামনে আমি
দাঁড়াতে পারিনা
হরিণীর চুল, চোখ, গাঢ় তীব্র ঠোঁটে
মধু-বউটির সামনে আমি আর দাঁড়াতে পারিনা

পিতলের চাবি খুলে আমাদের যুবরাজ কোন
দুর্গের ভেতর এমনি অন্ধকারে কোথায় গেলেন !

নদী যেন হয়ে যায় পাথরেরই শোক।

একালের উপাখ্যান

মধ্যাহ্নে থামেনা কেউ আজ
হরিবাবু এই শেষ পবিত্র বয়সে চলেছেন গঙ্গাস্নানে
রুপোর জলের ঘটি তার সঙ্গে, আর আছে দাঁতের মাজন
পেছন পেছন তার ধুতির দেড়খানি

পাখিদের তাড়া আছে, ওরা উড়ে যাবে
পিরামিডের চুড়োয়, উপত্যকায় যেখানে সাঁওতাল রোদ
চক্‌চক্‌ করছে ক্ষুরধার শিঙের গোড়ায়

কেউ নেই, এই দগ্ধ চরাচর ঘিরে কেউ নেই
বটের পাতারা আরো বুড়িয়েছে, এ-বছরও গেলো—
বাঁশি শোনা গেলোনা ঝাউবন থেকে, কৃষ্ণ
কোথা-রে ডাকলোনা রাত, তবে কি খোঁজটি
পাওয়া যায়নি তার

নিজেকে জানবার বুঝি সময় ফুরালো
অথবা নিজেকে এমনি করে জানাবার।

জাহিদ মুস্তাফা

এখনই উল্টে যাবে সমস্ত ভুজঙ্গ রাত

শোনিতে আগুন জ্বলে, তবু বলি পালাও পালাও
যে আগুনে আমার সাড়ে পাঁচ ফিট দেহে জেঁকে বসে
হেঁকে বলে—সে এখন জীবন্মৃত।
মৃত্যুর পথ বেয়ে একটি অলৌকিক সত্য
বারবার জানিয়ে যায় আমি আছি, বেঁচে আছি।
ধুঁকে ধুঁকে নষ্টপ্রাণ নিজস্ব আয়তন থেকে
উঁকি দ্যায় লোকজ নিসর্গে
দ্যাখে জনতার হাতে হাতে তাসের তুরুপ
যেনো এখন উল্টে যাবে সমস্ত ভুজঙ্গ রাত।

সার সার জনতার ভীড়ে বন্ধুকে দেখলাম
দেখি সে এক উজ্জ্বল মুখে অনাবিল প্রত্যয়
যেনো ফাঁক পেলেই নিজ হাতে মুছে দেবে অন্যায়ের দাগ
বন্ধুকে বললাম—কেমন আছো ?
বন্ধু বললো—এই আশ্বিনে চমৎকার শীত
তবু রক্তের সাথে আমার নিয়ন্ত্রিত মুখ
এখনো নিয়মিত পাল্টায়।

তারপর দেখলাম একসার মহিলার সাথে
আমার ভালোবাসা হেঁটে যাচ্ছে দৃঢ় পায়ে পায়ে
তার সাথে আমার প্রণয় দীর্ঘকাল ওজনবিহীন
উঠেছে নেমেছে।
আগে সে আহ্লাদী বালিকার মতো সাজপ্রিয় ছিলো
এখন প্রসাধন করেনা।
বললাম—কি খবর, বহুদিন দেখিনা তোমায়
শুনে সে আগের মতো ঈষৎ হাসিতে

প্রকৃতিতে তোলপাড় করে বললোনা—ভালো আছি
কেবল দু'পাশে দু'টি মুষ্টিবদ্ধ হাত
জানিয়ে দ্যায়—পুরনো ময়ূর পালক বিদায় বিদায়।

বাবা তুমি কেমন আছো ? তোমার সেই বুকের ব্যথা
কমেছে তো ? মা কেমন আছে, ওরা সবাই ?
ভদ্রলোক বুড়িয়ে গেছেন
কপালের কুঞ্চনও ঈষৎ বেড়েছে
সামনের পাটিতে অবশিষ্ট ক'টি পান-খাওয়া কালো দাঁত
জানিয়ে দ্যায়—তিনি একদিন যুবক বয়সে
আস্ত মাছের মুড়ো চিবিয়ে খেতেন
মা'র কাছে শুনেছি বাবার কতো ভোজন-কাহিনী !
ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে যেনো রাজকীয় নির্দেশ
পাঠ করছেন, হুবহু তেমনি করে বললেন
কে তোমার বাবা ? আমরা সবাই এখন সৈনিক
আমাদের ভালো-মন্দ আমরাই বুঝি।

একে একে দেখলাম জন্মের সহোদর, পাড়া প্রতিবেশী
যে যার মতো মিছিল এগিয়ে নিয়ে যায়
আমাকে আহ্বান করে আসুন ভাই, মিছিলে দাঁড়ান
অথচ চিনতে পারেনা কেউ
এমন কি পাড়ার সবচে' বুড়ো ওদুদ মাষ্টারও
যে আমাকে কোনোদিন তুই তুকারি ছাড়া ডাকতেননা
তিনিও কাঁপা হাতে চশমা খুলে আমাকে দেখলেন
বললেন আসুন আসুন।
আমি বুঝতে পারিনা এ কিসের আহ্বান
কেনো এই না চেনার ভান !
নাকি বহুদিন দূরে দূরে থেকে ভুলে গেছি সবার চেহারা
ভুলে গেছি দূরের দোয়েলের করুণ আর্তনাদ ?
নাকি আমার অলক্ষ্যে ঘটে গেছে বিরাট বিবর্তন ?

মিছিল এগিয়ে যায়, বেড়ে যায় জনতার দল
আমি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি,
শ্লোগান-মত্ত শহরের এক দীনহীন ফুটপাতে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলের মাঝে খুঁজি আমার জননীকে।
মা কেমন আছো মা ? আমি তোমার অভাগা সন্তান
তবু মা আমাকে চিনতে পারেননা
কেবল নির্লিপ্ত স্বরে মন্ত্রোচ্চারণের মতো বললেন—
আমার সন্তান এখনই ভূমিষ্ঠ হবে।

বকুল বাগানে সেই সংখ্যালঘু ফুল

এতোটা সহজে তুমি কাছে এলে ভুলে যাই ভালোবাসা মানে
চিরপুরাতন এই শব্দের আখরে আখরে আজ কেমন
প্রয়োজনহীন বেহালার উন্মনা সুর বাজে কিনকিন
তাল কেটে যায় তবু মাথা নাড়ি আর ক্লান্ত হই

জানি এতোটা সহজ তুমি নও ছিলেনা কখনো
বিকেলে নিঃসঙ্গ হলে শত্রুরাও কাছাকাছি আসে
তাই বলে তুমি এলে, এসে গেলে ঠিকঠাক ?
ভয় নেই, দ্বিধা নেই ? আমারতো আছে
এখনো জড়িয়ে আছি গোলাপে কাঁটায়
রাত এলে চলে যেই দেহ জুড়ে বোশেখী আছড়
মানেনা কে বালিকা কে যুবতী না বুড়ি আইবুড়ো
(এই তো যেদিন তুমি আমাকে শেখালে বিরহের মানে
পরস্ত্রীর ঠোঁটে দ্বিধাহীন চুমু দেয়া অথবা
মুখে খুব করে কালিঝুলি মেখে রাস্তায় বেরুনো
আর বারে পাভে প্রিয় বিদেশিনী মদ খুঁজে হন্যে হওয়া)

বিষের পেয়ালা নয়, ফাঁসীর রজ্জু নয়
চেয়ে দ্যাখো ধরে আছি জ্বলন্ত সিগ্রেট—স্মৃতিভার
ধোঁয়া ওড়ে, ধোঁয়ায় পেঁচিয়ে ওঠে মনস্তাপ—অতি পুরাতন

কিযে লেখা আছে ওই ধোঁয়ার ভিতরে
কি-যে লে-খা আ-ছে !

মাঝখানে পাখি ও পদ্য নেই, কোনো ব্যারিকেড নেই, পূর্ণিমা
আছে

উড়ুক্কু মেঘের খুব কাছে আছে শব্দজঙ্গল
দেখা হলো, দেখা হয়ে গেলো এই সংক্রামক পটভূমিতে
কি খবর কেমন আছো—বলেই উল্টো হাতে চটাস থাপ্পড়
রক্তে গন্ডদেশ ভরে যায় তবু অশ্রুপাত করেনি সমবেদী বাংলাদেশ
শুধু আমার সমুখে এক উপবন হয়েছে বাগান
এক বৃদ্ধা বারবণিতা ফেরত পেয়েছে তার সিকি যৌবন
তাই ফুলেদের সাথে আজো প্রজাপতি দোল খায় পাপে-পুণ্যে

প্রতিবাদহীন এক দিবসে দেখা হলে পকেট থেকে তুলে আনি
কালো ব্যাজ—তোমাকে দেখাই
আর তোমার হাতে ভ্যানিটি ব্যাগের বদলে শাদা ফ্লাগ
সন্ধি প্রস্তাব নাকি বিচ্ছেদ, সন্ধি বিচ্ছেদ ?

জানি এতোটা সহজ তুমি নও, এতোটা সহজে
বেদনার গাঢ় ঘুম, বিরহ ঘুম—ভাঙেনা কখনো
তাই চুপিচুপি নামতা শেখার মতো অপলাপে
দরোজায় টোকা দিয়ে মিশে গেছি হাওয়ার শরীরে
শুধু বারান্দায় উৎকর্ণ ছিলো জোড়া কর্ণ—শুনবো কখন
তোমার পায়ের আওয়াজ
আর ছিলো উৎসুক চোখ—তোমাকে দেখবে বলে সেই চোখ—
সেই জোড়া-চোখকে পাঠিয়েছিলাম জানালা পথে
প্রতিদ্বন্দ্বী এসে দাঁড়িয়েছে দরোজায়
কপাটের আড়ালেই ত্রস্ত আঁচল মুখে চেপে
তুমি নেই, দাঁড়িয়ে নেই
প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখের সামনে ধুধু আকাশ, তাহার অপেক্ষায়
কেউ নেই

দুপুরবেলায় একি উটকো ঝামেলা—বলে আলস্যে হাই তুলে
দরোজায় খিল এঁটে প্রতিদ্বন্দ্বী ঘুমুতে গেলে। সবুজ শয্যায়
আর আমি অবয়বে ফিরেছি যখন, স্বাধীন বাতাস দিলো শীস
তুমি এসে কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালে পাশেই
এতো কাছে আছো, ঠোঁটের কম্পনে তবু তুমুল সংশয়

এতোটা সহজে তুমি কাছে এলে ভুলে যাই
আমার আর কোথায় যাওয়ার আছে—আজ রবিবার
কোথাও ঠিকানা নেই, পকেট বোঝাই শুধু রফতানির অযোগ্য
কাগজ
ডাক্তারের স্বাদু উপদেশ, ট্যাবলেট—ঘুমের ওষুধ
আর ব্যবহারিক চিঠি—উত্তরের অপেক্ষায় আজো পকেটে আছে
মনে পড়ে, শুধু মনে পড়ে—এখন শ্রাবণ মাস
সামনের ভাদরে আমার জন্মদিন—একুশ বছর
আর মনে পড়ে—কবে বকুল বাগানে কোন নামহীন ফুল
বয়ে এনে ঝরিয়েছো শান্ত কুসুম
সেই ফুল, বকুল বাগানে সেই সংখ্যালঘু ফুল
আজো কাঁদে অভিমানে—কুসুমের দুঃখে।

... ...

হারুন রশিদ

কবে তোমার সময় হবে

তোমার চোখে স্বপ্নেঘেরা সমুদ্দুরের পাগলা পেখম
মিতু তুমি কেমন আছো এই বিকেলে ?
এই বিকেলে যেমন থাকে পানা-পুকুর, শান্ত মেয়ে
তেমনি তুমি কেমন আছো, কেমন থাকো রাত পোহালে ?
তবুও দিন কাটছে নাতো
যেমন তুমি চিঠির ভেতর চিত্র আঁকো
শূন্য বুকে কেবল দোলে দোয়েল পাখি
মাতাল পাখির বায়না বড়ো।
তোমারো কি তেমন আছে স্বপ্ন কোনো
বুকের পাশে ঘুমিয়ে থাকার ?
ধু ধু মাঠে খলখলিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে যাবার
ইচ্ছে জাগে বন্য হাতে ওলোট-পালোট হতে থাকুক
তোমার শরীর ?
শাড়ির খুঁটে চাবির গোছা
শিশুর মুখে নিপল দিয়ে সুদূর পানে উদাস হতে
রেলিঙ ছুঁয়ে তোমার কোনো ব্যাকুল-ফেরা গুমরে মরে ?
কখনো কি ইচ্ছে জাগে
শোকে তাপে দুমড়ে-মুচড়ে প্লাবন আসুক
প্লাবন আসুক ?
বিষাদবোধে কিছুই তোমার ভাল্লাগেনা
এমনি যখন দিশেহারা ছুটতে থাকো ঘরের মেঝে
এদিক ওদিক
তখন তুমি বালিশ দুটো জন্তু বলে আছাড় মারো ?
খাটের পায়া কাঁপতে কাঁপতে বলে নাকি তখন তোমায়
মিতু তোমার কি হয়েছে ?

এমন করে কাঁদছো কেন
কিসের জ্বালা পুষছো তুমি অহরহ ?
শুনতে পেলুম মাকড়সারা যখন তোমার
ক্যালেন্ডারের তারিখগুলো গিলতে থাকে
তখন নাকি তোমার বুকে ঘন্টি পেটায়
বুড়ো একটি বটবৃক্ষ।
এমনিতরো সময়গুলো আমার বড়ো প্রিয় মিতু
তখন তুমি দেখতে কেমন
কেমন তোমার হাঁটা চলা
দিন বদলের খেলার পালা
ইচ্ছে জাগে দেখে আসি, ঢাকা ছেড়ে ছুটে পালাই
প্রতিদিনই মনে মনে কুষ্টিয়া যাই, টিকেট কাটি
তবুও দ্যাখো হয়না যাওয়া
আমি কেবল হাওয়ায় উড়ি।
মনে পড়ে চৈত্র মাসে কী যেন এক মেলায় বসে
তোমার সংগে স্বপ্নে দেখা
আমরা দুজন পরস্পরের আঙুল ছুঁয়ে হেসেছিলুম
শুধু বললে, কেমন আছো
আবার কবে দেখা হবে ?
হঠাৎ আমি আমার বুকে ফিরে এলুম।
আচ্ছা মিতু, বৃষ্টি-বাদল ঝড়ের মতন
যখন তোমার ছোট্ট প্রাসাদ নাড়তে থাকে অষ্ট প্রহর
তখন তুমি কার ধ্যানে প্রদীপ জ্বালো
তপমালা জপতে জপতে হয়ে ওঠো সন্ন্যাসিনী ?
কলেজ যখন নিঃসার ঘুমে চেতনহারা
তখন তুমি কেমন থাকো ? কেমন থাকো ?
কেমন করে কাটে তোমার স্বজনহারা একলা-দিন
একলা-পথ নাচায় নাকি তোমার কোনো গোপন তিল
কিংবা তোমার পিঠের ওপর
দুষ্টু চিমটি দেয় বুঝি কেউ ?
ক্লাসরুমে তোমার সংগে আর কে আছে

আর কে থাকে সারাক্ষণের সংগী সেজে
কে কে তোমার বুকের ভেতর
তোলে তীব্র নিশির নিনাদ ?
আমার বড়ো তেষ্টা লাগে।
কষ্ট জাগে উথাল-পাথাল
যখন আমি তোমায় ভাবি
গলতে থাকি জমাট-বাঁধা বরফ কুচি
তোমার কথা রাত-বিহনে সবার কাছে বলে বেড়াই
তোমায় ছাড়া শয্যা আমার দুঃখ দুঃখ খেলায় মাতে
একলা একলা বড়োই কাতর ঘড়ির কাঁটা।
তবুও দ্যাখো আমার ঘরে
টিকটিকিরা বেভুল ভেবে কাঁদায় টেবিল
আমার ভাঙা চেয়ারখানি
বইয়ের শেলফে আটকে থাকে
আরশোলাদের দুঃখ-সুখের জীবনযাপন
বুদ্ধদেবের কঙ্কাবতী।
তুমি আমার একলা-পাখি
যখন তখন ধরতে গেলে ফুড়ুৎ করে উড়াল দিলে
বুকের খাঁচা কঁকিয়ে ওঠে, উষ্ণ-নহর
গুনগুনিয়ে গানের হাওয়ায়
ভাসিয়ে দেয় এক্কা-দোক্কা খেলার পালক।
পাশের বাসার কচি মেয়ের দু'চোখ বেয়ে
উপচে পড়ে আমায় দেখার লোভটুকু তার
তবু আমি তোমায় নিয়ে গাঁথতে থাকি ফুলের মালা
তোমায় আমি ভাঙতে থাকি হাতের মুঠোয়
ইচ্ছে মতো চিঠির ফাইলে লুকিয়ে রাখি
কাটুস-কুটুস কাটতে থাকি তোমার দেয়া দুঃখগুলো।
কোথায় তুমি দেবে একটু লজ্জামৃদু ওষ্ঠ ছুঁয়ে
চুলের ভেতর বিলি কেটে
কিন্তু দেখি কেমন তুমি উড়ংচণ্ডি সুভাব পেয়ে

বড়ো বেশি কষ্ট দিচ্ছো আমার বুকে।
যদি তুমি নইবা দিলে পাহাড়সম
তেমন কোনো গভীর কথা
এবার আমি ঠিকই তবে পালিয়ে যাবো
রাজশাহীতে মনি'র কাছে
যেথায় গেলে শহর আমায় তুলে নেবে আপন করে
কৃষ্ণচূড়া আমায় দেবে প্রেমের হিয়া
অন্ধকারে দু'জন মিলে জড়িয়ে নেবো মাছের মতো
চাদর-পাতা বনউপবন
তেমন করে হারিয়ে যাবো সাগর জলে।
সিঁদুর পরে আসবে দ্যাখো তিনটে পরী
আমাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে দেবে সোনার খাটে
তখন তোমার হিংসে হবে?
তন্ত্রীগুলো ছিঁড়ে যাবে?
বলো মিতু তখন তোমার ভারী বুঝি কান্না পাবে?
রক্ত-কণায় ডাকবে বুঝি কেবল আমায়ঃ
চলে এসো বুকের মাঝে?
জ্যোৎস্না-রাতে যখন দ্যাখো এলোমেলো শিশির ঝরে
পাহারাদার মুঠি খুললে ঝরে কেবল হলুদ পাতা
তখন কি খুব আমার কথা মনে পড়ে?
পদ্মাতীরে যখন তুমি ঢেউয়ে ঢেউয়ে
বুনতে থাকো ভবিষ্যতের নকশি কাঁথা
আমার কথা তখনও কি মনে পড়ে? মনে পড়ে?
শুনেছিলুম পাথর নিয়ে তুমি বড্ড বড়াই করো
তোমার কাছে পাথরই সব
পাথর তোমার প্রাণের সখা
বুকের মধ্যে লালন করো
ঘুমিয়ে থাকো পাথর নিয়ে
দিনরাত্রি তোমার মুখে পাথর ছাড়া কোনো কথাই
শুনছেনা কেউ, শুধুই ডাকো পাথর পাথর

কুড়াতে যাও সকাল সন্ধ্যা পদ্মাতীরে
আমিই কি সেই পাথর তোমার ?
বলো মিতু, কথা বলো, আমিই কি সেই ?
কিন্তু তুমি জনোইতো সব
আমিতো সেই কবে থেকেই তোমার দিকে বাড়িয়ে আছি
আমার যতো শব্দ আছে
তবুও কেনো হাত গুটিয়ে করুণ চোখে তাকিয়ে আছো
কেনো তুমি একটা-দুটো কাকের কাছে যাচ্ছো হেরে ?
ইচ্ছে হলেই যেমন খুশি নিতে পারো
আমার গলায় লেপ্টে-থাকা রঙিন রুমাল
চোখের কোণে ঝিলিক-দেয়া অশ্রুকণা
এখনো কি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কেটে যাবে সারা-সকাল ?
কবে তোমার সময় হবে বলো মিতু
কবে তোমার সময় হবে ?
কবে আবার ভাসিয়ে দেবে আমার বুকে
এক্কা-দোক্কা খেলার পালক
খুশির ছোঁয়ায় উঠবে হেসে আমার ঘরের
ঝুল-বারান্দা, দোরের কপাট, ঝুল-বারান্দা.........

দুঃসময়

আমরা এখন কোনো কিছুতেই নেই
না বাহিরে না ঘরের বারান্দায় ; শুধু
চড়ুই পাখির আড্ডায় চলে আমাদের শাসন।
চারদিকে যে হা-হুতাশ. যে উন্মত্ত জলতরঙ্গ
নীলিমার পাখায় ফানুসের আত্মহনন
বুক চিরে রক্ত শুষে নিচ্ছে নিশাচর
আমরা নিশ্চল। আমরা অট্টহাসিতে শান দিচ্ছি
আঙুলের ডগায়, যেনবা হাত ছুঁয়ে
এক্ষুনি উড়ে যাবে অলোক কাফেরেরা
তবু কোনো কিছুতেই নেই।

এশিয়ার মাইলস্টোনগুলি এখন কী ভীষণ দিশেহারা।
নিরিবিলি অস্থিরতায় ভুগছে সীমান্তের ফেরী
আমরা নিজস্ব বিপন্নতা ভুলে গেছি
দৈনিক কাগজগুলিও মুখর হয়ে আছে দৈবে
কখনো গৃহিনীর কপোল-ছোঁয়া জলে।
টপটপ ঝরছে বিদেশী আগ্রাসনের পালক
'শেভ্যালিনে'র গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়
তবু কোনো কিছুতেই নেই। আমরা এখন শুধু
আশ্বাসে ও প্রজনন স্কীমে বেঁচে আছি।

সত্যের সোপান থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আজ
সিরামিকের তোরণে পরিয়ে দিচ্ছি জয়তু মালা
তবুতো দারিদ্র-সীমার নিচে লকলক করছে
পুষ্টিহীন যাযাবর শিশু
আমরা কিচ্ছুতে নেই,
কার স্ত্রীর শরীরে হায় ঠাঁই পাচ্ছে থান-কাপড়
কার ঘরে কাল-নাগিনীর উদ্যত ফণা
এক-ফোঁটা শিশিরের চুমুর জন্যে তাকিয়ে আছি।
কী আশ্চর্য চারদিকে এতো আয়োজন
এতো সব তীব্র দহন
উপত্যকাগুলির নাভিতে জমছে ভয়ংকর প্রবাল
মহাসাগরগুলিতে ছুটছে অসংখ্য তারা খচিত পতাকা
সাইবেরিয়ার হিমেল প্রাসাদ-হাওয়া
তবু আমরা নির্বাক, কিছুতেই নেই।

কোনো কিছুতেই আমাদের হেজা-মজা নদী ছাপিয়ে ওঠেনা
কাঁকড়ার আলিঙ্গনে উৎফুল্ল নেচে ওঠে হৃদয়
আমরা 'শান্তি শান্তি' বলে কোনো সেমিনারেও
চিল্লাতে পারিনা।
আমরা এমনই সব বোদ্ধা পুরুষ
এমনই শাসনের শৃঙ্খল পাহারা দিচ্ছি আজকাল

খরায় কুঁকড়ে-যাওয়া কংকালের বন্ধভূমি ছুঁয়ে
বলতে পারিনা আমরাও অনাহারী
আমরা রাজপথ কাঁপিয়ে দেবো আসছে বৈশাখে।
আমরা কিচ্ছুইতো পারিনা
কোনো কিছুতেও নেই
শুধু নিস্তব্ধ রাতের মতো অন্ধকার হয়ে থাকি
শুধু অন্ধকার প্রাকারে জ্বলে অক্ষমতার টিমটিমে শিখা।

আমরা এখন কোনো কিছুতেই নেই
তবু উপদ্রুত দূর-দিগন্তে উত্থিত হচ্ছে বায়ুবীয় জ্বালা
শব্দের ভেতর থেকে উঠে আসছে শব্দের জ্যোতি
সিপিসিপ শব্দে এক অদম্য বাসনা
আমরা বুঝিনা !
বুঝিনা কিছুই ? তবে এক চিলতে রোদের জন্যে
কেনো এই উন্মুখ প্রতীক্ষা ?
কেনো প্রতিদিন ঘুম ভাঙলেই শুনি অনাহুত সাইরেন
বুক খুললেই বেরিয়ে পড়ে অবক্ষয়ের তুলি ?
আমরা বুঝিনা ! আমরা ভাস্কর্যের মতো স্থবির........

হায় এমন দিনে আমরা কোনো কিছুতেই নেই।

উদ্বাস্তু মানুষদের ঘুম

গতকাল রাতে আমি এক উত্তুঙ্গ স্বপ্নের ভেতর হেঁটেছি
লক্ষ কোটি মাইল
কারো গুটানো পা, কারো সাড়াশির মতো দুই হাত
সেঁধিয়ে ছিলো এক অতল গহ্বরে, বিভীষিকায় দীন হীন
তবুও আমাদের জানলার শার্সিগুলো
বেসামাল যুবকদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।
মানে মানুষ, উদ্বাস্তু মানুষদের চোখ থেকে
কেড়ে নিয়েছিলো ঘুম
ঘুমের জড়তা থেকে এক পালালিক পশু

দিন নেই, রাত নেই কেবলি তুলেছে হুংকার
কেবলি খুবলে খেতে এসেছে মানুষের নৈমত্তিক জীবন।
মানুষদের কোটর থেকে নিঃসৃত ভালোবাসা শুষেছে
প্রাচীন উন্মত্ত ক্ষত
শুকাবার সময় নেই, নেই কাঞ্চনজংঘার মালতী বধূ,
কোথাও কিচ্ছু নেই, শুধু পাতাবাহারের ঢেউ
শধু গুঞ্জন করে কাল-বৈশাখী মেলা।
তোমরা কেমন আছো হে মানুষ ?
তোমরা কেমন থাকো এই খরার প্রলয়ে ?
এমন কতো শত প্রশ্ন ছুটে আসে
রাজনীতির মঞ্চ থেকে
এমন কতো শত কুশল মানুষের গা বেয়ে বেয়ে পড়ছে
এমন কতো শত প্রতিশ্রুতি আহা দিয়ে যাচ্ছে নির্বাচন
তবুও কি মানুষ বুঝেছে ওরা শুধু নিজেদের
তল্পি গোছানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে ?
বোঝেনি। এ অবুঝ উদ্বাস্তু মানুষেরা কোনোদিন বুঝবেনা
এরা এই না-থাকার পঞ্চবীথি মানুষেরা
শুধু ক্ষয়ে যাবে, শুধু অজস্র শ্রমের দেশে কাঁদবে
মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ট্রেঞ্চে লুকাবে।
কিন্তু মিছিলের অগ্রভাগে রাজহাঁস, পাতিহাঁস দেখে
ঝাঁপিয়ে পড়বেনা
এরা বোঝেনা মিছিলে কোনোদিন কোনো শান্তি আসেনা
কোনো আইনও পাল্টে যায়না দ্রুত
কিংবা পার্লামেন্টে গমগম কেঁপে ওঠেনা মাইক্রোফোন
মিছিলে আসে শুধু রক্তের নগর তটিনী
শুধু হাসপাতালের রেলিঙে পায়রার বাক-বাকুম
আর কেউ নয়
আর কেউ কখনো ভুলেও মাড়ায়না এ-শংকুল পথ
কাঁকড় বিছানো পথ শুধু কান্না ঝরাতে জানে।
ইটের গাঁথুনিতে যে প্রাসাদ ক্রমশ উঠছিলো
যে প্রাসাদ দিনদিন গগনচুম্বী হতে বাড়িয়েছিলো গ্রীবা

যে প্রাসাদ মানুষের ভালোবাসার আশ্রিত সুন্দর
যে প্রাসাদ থেকে নেমে আসবে যীশুর প্রেম
তা এখন দেবতাদের বাগান-বাড়ি।
কথাছিলো তেমন কোনো দানব এসে পারবেনা
মানুষের হৃদয় কেড়ে পাথরের পাহাড় বানাতে
কথাছিলো সবুজ সরল দুই চোখ থেকে কেবলি ঝরবে
অনাবিল দুই গঙ্গার দু'স্রোত
হিশেব মেলেনি। শেষে তো কিছুই হলোনা মানুষ
কিছুই হলোনা। কি করে হবে এই যজ্ঞের পুরীতে ?
কি করে হবে শশীর শুভ্র সম্ভাষণ ?
এ পোড়ার দেশে তোমাদের জন্যে কোনো জল নেই
তোমাদের জন্যে কোনো স্বপ্ন নেই, কোনো হাড়ি-চালা
নালিতা ঘাসের জড়াজড়ি নেই
এইসব চুলোহীন মানুষের জন্যে কোথাও কিছু থাকেনা
কোনোকালেই জাগেনা জীবনের ভোর
এরা এতোই অচেতন
এরা এতোই কোমলপ্রাণ
এরা শুধু গাইতে জানে ঘুম-জাগানিয়া গান
জানেনা কীভাবে তুলে নিতে হয় ধাতব নূপুর
এরা এই শঙ্খ-স্বভাবী মানুষ কিছুই জানেনা।

হে মানুষ, হে নিঃস্ব মানুষেরা এবার নাচাও পথ
এবার তুলে ফেলো শরীর থেকে ঘুম-পাড়ানীর আলপিন।

কফিনের সেতু

অন্ধ আঁস্তাকুড় থেকে একজন পথিক এইমাত্র বেরিয়ে এলেন
শহরের প্রতিটি ইট, প্রতিটি পাতা
তাকে জানাচ্ছে স্বাগত সম্ভাষণ
আর ঝড়ের প্রতীক্ষায় একজন নগরবাসিনী
একলা-রাত জেগে হাসির দমকে হারিয়ে দিচ্ছেন মাঠ
আমরা দুঃখী-দীঘির জল কলসি ভরে রেখে দিই ঘরে
গভীর বিবরে উদ্বেল হয়ে ওঠে জন্মের তিথি।

ঐ পথিকের, নগরবাসিনীর এতো বছরের প্রতিবাদ সত্ত্বেও
সর্বস্ব খুইয়ে বসি পরাজিত মানুষ
সর্বস্ব হারিয়ে যাই মাটির কাছাকাছি।
চিনিনা ঐ পথিকের চলমান ছায়া, অমল ক্ষিপ্রতা
অচেনা হয়ে ওঠে শহরের আগ্রাসী দেয়াল, প্রেত-পুরাণ
তবুও রক্তে বান ডাকেনা
পিছলে যায় পরিচিত শোক, নিরন্ন প্রতীক্ষা
শুধু রুক্ষ পাথর চৌচির করে দেয় কুমারী স্বপ্নের ট্রেন।
আমরা প্রস্তরে স্থির হয়ে থাকি
আমরা পড়ন্ত আলোর দিকে তাকিয়ে ভাবি
গণ-কফিন থেকে কবে বেরিয়ে আসবেন একজন যীশু
ঐ পথিকই হয়ে ওঠেন যীশুর আদল।
শহরের প্রতিটি ইট, প্রতিটি পতা
যীশু যীশু চিৎকারে কাঁপিয়ে দিচ্ছে বায়ু
তুমিই সর্বত্রগামী
আমরা জানি তোমার বুকেতে লুকিয়ে আছে
অশ্বক্ষুরের উৎসব-তোরণ
ঝড়ে ও বর্ষায় তুমি মৃত্যুকে লঙ্ঘণ করো।
শহরের কংক্রিট ফুঁড়ে হিম-রাত্রির সাপ এখন
চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে তীব্র বিষ
ভিতে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে ইউরো-এশিয়ার
পাতাশূন্য পোড়াডাল
ট্রেঞ্চ ভর্তি জমাট-বাঁধা হিমোগ্লোবিন।
নগরবাসিনী প্রচন্ড অভিমান নিয়ে তাকিয়ে দেখছেন
আমরা নৈশবৃক্ষের শিকড়গুচ্ছ কেটে চিতায় তুলি কিনা
তিনি ছুঁয়ে দেবেন নিঃস্তরঙ্গ নক্ষত্রের কাল।
এইভাবে শরীর দুলিয়ে চলেন পথিক
কংকাল নিঃশ্বাসে ঝরে ধুলো
তবু প্রতিদিন আমাদের দিকে গড়িয়ে পড়ে দুঃখের পাতা
আর উপায়হীন আমরা পারাপারের আশায়
কফিন থেকে কফিনে বেঁধে দিচ্ছি সেতু।

জাহিদ মুস্তাফা

আমার মন কেমন করে : আবিদ আজাদ

আবিদ আজাদ এদেশীয় তরুণ কবিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঘাসের ঘটনা' এদেশের কাব্য-পিপাসুদের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছিলো। কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললে এরকম দাঁড়ায়—কাব্য পিপাসুদের মনোরাজ্যে তিনি এক নতুন ক্ষুধার জন্ম দিয়ে আবার নিজেই তার নিবৃত্তি ঘটিয়েছেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার নতুন কাব্যগ্রন্থ 'আমার মন কেমন করে'। একথা স্বয়ং আবিদকেও স্বীকার করে নিতে হবে—প্রথমটার তুলনায় তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ খানিকটা দুর্বল, অযত্নে-ভরা প্রয়াস। তবুও দ্বিতীয়বারের মতো কবির মুখোমুখি হবার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে 'সে' প্রকাশনী অনেক অনেক ধন্যবাদার্হ।

আমার মন কেমন করে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের একটি গানের পংক্তি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি এই নামকরণ করেছেন। আর এই নামের সংগে সংগতি রেখে কবি গ্রন্থভুক্ত করেছেন এমন সব সংক্রামক কবিতা যাকে প্রেমের কবিতা বলে চিহ্নিত করতে হয়। বুঝি সে কারণেই 'ঘাসের ঘটনা'র তুলনায় বিষয় বৈচিত্র্য অপেক্ষাকৃত কম।

শুধু নির্জলা প্রেমের কবিতার এক স্বাদ, আবার বারোয়ারী বিষয়ের কবিতার আরেক স্বাদ। কবিতার মানদণ্ডে কোনটির মূল্য অধিক সেই তুল্যমূল্য বিশ্লেষণে যেতে চাইনা, তবে একথা ঠিক বিষয় বৈচিত্র্য থাকলে কবিতা-পাঠকের পক্ষে কবির অন্তর্জগত থেকে শুরু করে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে কবির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া সহজ ও আন্তরিক হয়।

শুধুমাত্র প্রেমকে উপজীব্য করে কাব্যচর্চা করেছেন এমন কবির সংখ্যা পৃথিবীতে নেহাত কম। অবশ্য আবিদকে আমি

এই দলে টানছিনা, তবে রোমান্টিকতা তার অনেক কবিতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিশেষত আলোচ্য গ্রন্থভুক্ত অধিকাংশ কবিতাগুলি এই পর্যায়ের।

আবিদের রোমান্টিকতা সঞ্চরণশীল, প্রবাহিত। এই গতি, এই চঞ্চলতা তার কবিতাকে প্রাণস্পর্শী করে তোলে, কবিতায় বিশ্বত বিষয়ের সাথে পাঠক জড়িয়ে যান আষ্টেপৃষ্ঠে। অনেকটা জ্বরো-রোগীর ভিতরকার অনুভবের মতো বিদ্যুৎ খেলে যায় তৃপ্ত পাঠকের শিরায় শিরায়। কবিতা ও পাঠকের এই সঙ্গমস্থলে কবির ভূমিকা অনেকটা ঈশ্বরের মতো। এখানে আবিদ যেনো সফলতর ভূমিকাভিনেতা। কবির আবেগঘন উচ্চারণে দুলে ওঠে মর্মমূল।

> সে নেই যদি রেলিং তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন ?
> আমার মন কেমন করে আমার মন কেমন করে।
> (আমার মন কেমন করে)

এই কবিতার নামেই গ্রন্থের নামকরণ। কবিতায় বর্ণিত ঘটনার প্রেক্ষাপট বড়ো, অথচ এটি একটি ছোটো কবিতা, সাকুল্যে দশ পংক্তির। এতো ছোটো কবিতায় এই বিরাট প্রেক্ষাপটের সঠিক প্রতিফলণে কবির শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কখনো তার কবিতার আবহে একটি বিষন্ন সুরের রেশ রোমান্টিকতা ভেদ করে বেরিয়ে আসে। এই সুর শ্বাশত কল্যাণের, চিরকালের। যেমন একটি কবিতায়ঃ

> একদিন বালকটি টের পায় শেষ বিকেলের
> কিরণের মতো তার কপালে বালিকাটির হাত
> বিলি কেটে দিলো ঘুম, অসুখের ভিতরে আঙুল
> বুলিয়ে ফুরফুরে করে দিলো তার চুল জট-বাঁধা স্বপ্নগুলি
> ... ...
> মনে হলো তার হাড়-মজ্জা, রক্ত ও হাতের তালা থেকে আজ
> উঠছে ন্যাপথালিনের ঘ্রাণ।

আর চোখ মেলে দেখলো সে ভেসে ভেসে চলে যায় বালিকাটি
দুদিকে দুলিয়ে দিয়ে জন্ম ও মৃত্যুর মতো তার দু'টি বেণী।
(তৈলচিত্র)

পড়তে পড়তে মনে হয় কবিতাটি কবিতা নয়, তৈলচিত্রই বটে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তন্ময় হয়ে পড়তে পড়তে শেষ করে রেশ কাটতে না কাটতেই চক্ষু নিমীলিত করলে বন্ধ চোখের পাতায় ভেসে উঠবে তৈলচিত্র। রুগ্ন বালকের শিয়রে বসে আছে বালিকা, মুখোমুখি দু'জনে স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে। শব্দের নিগরে চিত্র ফুটিয়ে তোলার এই অনুপম দক্ষতা জীবনের সফল একজন রূপকার হিশেবে আবিদকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

আবার এই আবিদই সুন্দরতর একটি রূপকল্পের ভিতর দিয়ে যেনো একটি স্বচ্ছ আয়নায় বিম্বিত যৌনতার শিল্পসম্মত ব্যবহারও করেছেন তার কবিতায়। যেমন ঃ

কুশ্রী মেয়েটিকে আমি এই বলে সান্তনা দেই যে
তার চোখ দুটি গুচ্ছভ্রমরের নৈঃশব্দ কালো চুল হতাশার ঢল

... ...

আমি এইভাবে আমার কথার ভিতর নিছক সাধারণ মেয়েটিকে
বন্দী করে ফেলি

... ...

আমার কথার পিঞ্জরে বন্দিনী
সত্যি সত্যি বিস্ময়াভিভূত এই শুভ্র মেয়েটি এমন অনায়াস
আত্মসমর্পিত
কিন্তু আমি মিথ্যুক ময়নাটিকে আনন্দের দাঁড়ে
মাথা কুটতে দেখে
প্রতিনিয়ত মরে যাবো।

(দাম্পত্য)

প্রেমের চরম লক্ষ্য এবং তার এই প্রতীক চিত্রণ পাঠকের

পরিচিত অথচ ধূম্রজাল ভরা জগত সম্পর্কে নতুন করে ভাববার অবকাশ করে দেয়।

এরকম আরো অনেক উদাহরণ দিয়ে কবির রোমান্টিকতা এবং তার শক্তিমত্তা যাচাই করা সম্ভব।

আরো কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি দিতে ভীষণ লোভ লাগছে। যেমন—এক শীতকাল, দুঃখ, হাওয়া, প্রতিকৃতি, বাসাবদল, মনে পড়লে, দ্বন্দ্ব, এলোমেলো এলিজি : হুমায়ুন কাদিরের স্মৃতির উদ্দেশে, পুনর্যাত্রার আগে, সমুদ্রের ভিতরে মানুষ মানুষের ভিতরে সমুদ্র ঘুরে ঘুরে, স্বপ্নে ফিরি, জন্মান্ধ, মানুষের হাত। কিন্তু আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার স্বার্থেই এই লোভ সংবরণ করতে হচ্ছে।

এর মধ্যে 'দ্বন্দ্ব' কবিতাটির প্রসঙ্গ টানছি এই কারণে—এতে কবির শব্দ প্রয়োগ, বাক্য গঠন একটু ভিন্ন রকমের।

'......মাতারী গোলাপীকে

... ...

ভুলিয়ে ভালিয়ে শেষে

ছাপড়ার ভিতরে নিয়ে ঝাঁপ বন্ধ করে দিলো শ্যাওলা-পড়া
ঐ বুড়ো জমির আলী। তারপর গোলাপীর
পায়ে ধরে হাতে ধরে মওতের মতো ঝরে গেলো আন্ধার বালিশে
গোলাপীর সুন্দর গম্বুজ থেকে খালি রি রি বালি ঝরে......
বালি ঝরে......

এইদিকে গোলাপীর বেলাহাজ হাঁটু
নিভুম নিভুম করা কেরাসিন লম্পর আলোয়
আল্লার চান্নীর মতো উদামবুদাম রোশনাই
মেলে ধরে......।'

আলোচ্য কবিতাটির বাক্য গঠন ও শব্দ প্রয়োগ ভিন্নতর হলেও এটি আমাদের একজন প্রধান কবির কাব্যরীতির প্রভাবমুক্ত নয়। এরকম কিছু কিছু কবিতা পড়লে মনে পড়ে আরো একজন

কবির কবিতার কথা। তার সংগে আবিদের কিছু কিছু ব্যাপারে খানিকটা সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে এই প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। চোখ কান খোলা রাখলেই কবিতা অনু-ধাবন করে ব্যবস্থা নিতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। তাছাড়া মানুষের সবকিছুই পরিবর্তনশীল। এ সম্পর্কে কবির একটি কবিতায় সুন্দর বর্ণনা দেয়া আছে।

'ফিরে এসে সব আগের মতো দেখা চাই
অথচ আমি দেখছি মানুষ নিজেরাই আগের মতো
কেউ আর ফিরে আসেনা
আবার ফিরেও যায় না'

কবির শক্তিমত্তা তার সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। তার কবিতা পড়লে এই বিশ্বাসবোধ জন্মে। কালকে অস্বীকার করে নয়, কালের ভিতর থেকে আবিদের উজ্জ্বল, পরিণত কবিতাবলী বেরিয়ে আসুক, বিশেষ চিহ্নিত হোক'এই কামনা করি।

কাব্যগ্রন্থটির প্রচ্ছদ করেছেন আবদুর রোউফ সরকার। গ্রন্থটি তার নামেই উৎসর্গীকৃত। প্রচ্ছদ ভালো হয়েছে, তবে কভার কালার আরেকটু গ্রীনিশ হলে আরো ভালো লাগতো। পুস্তক প্রকাশে বিশেষত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের আর্থিক অনিশ্চয়তার কথা জেনেও 'সে' প্রকাশনী যে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন সেজন্যে প্রকাশকদ্বয় বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ভবিষ্যতে তারা আরো উদ্যোগ নিলে আমাদের প্রবল প্রকাশনা সংকট কিছুটা অন্তত হ্রাস পাবে। গ্রন্থ প্রকাশক ও কবির দীর্ঘ সাফল্য কামনা করছি।

বইটিতে কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে। ছাপা সুচারু, বাঁধাই ভালো।

হারুন রশিদ

কল্লোলিনী কালের হাওয়া

তরুণ কবিরা সাবধান

এক দ্বন্দ্ব-মুখর আঙিনায় এসে পৌঁছেছে তরুণ কবিরা। এখন কারো ভিতরে যেন সহিষ্ণুতা শুইয়ে নেই। ভিতরালোকে সবাই সবার বিরুদ্ধে। ঈর্ষাপরায়ণতা, পরশ্রীকাতরতা যদি কাব্যহিংসায় জ্বলে উঠতো, তবে আমরা তাকে স্বাগত জানাতাম। কিন্তু একি বেপোরোয়া স্বার্থান্বেষী শব্দের, মননের বৈমাত্রেয় আগ্রাসন! এটা কি মেনে নেয়া যায়?

বলছিলাম সাম্প্রতিক দোদুল্যমান প্রতিপাদ্যের কথা। তরুণেরা অগ্রজের কাছে পাঠ নেবে। অথচ তাদের শ্রেণীতুল্য প্রতীতির সাযুজ্য পাওয়া দুস্কর। ফলতঃ বিভাজন এসে গেছে তরুণদের অতি সচেতন সুবিধাবাদী চারিত্রের। এরা সংঘবদ্ধ না হয়ে বরং আত্ম-নৈর্ব্যাক্তিকতা, আর মায়াকান্নার শিকার হয়ে পড়ছে। এজন্যেই তেমন একজন তরুণ বেরিয়ে আসছেনা যার ভিতরের রোদ্দুরের রঙ শিশিরের কোলে ঝল-মলিয়ে দেবে আহত শৈলীকে।

বরং তারা কুয়াচ্ছন্ন আঁধারে মাখামাখি করে শুইয়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। তরুণেরা সাবধান! বাইরে জানলার ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখা কিংবা শূন্যতার দিকে নির্বাক হয়ে তাকানোর দিন শেষ হয়ে গেছে। আপন-মুগ্ধ-মাধুরীতে নিমগ্নতা নয়, প্রয়োজন ব্যাপ্তী-বিশ্লেষণের। আর তাই শিল্পোত্তীর্ণ প্রকীর্ণ-তাকে সঠিক রূপ দিতে গিয়েই কবিতাকে নিয়ে যেতে হবে কল্লোলিনী কালের হাওয়ায়। যা মানুষের গভীরে—মর্মমূলে প্রচণ্ড নাড়া দেবে লাভা উৎগীরণের মতো। শুধু রোমান্টিকতাই তরুণদের কাছে প্রধান হলে পাথুরে-পাহাড় ধ্বসে শিলালিপি গড়িয়ে পড়তে দেরি হবেনা। সুতরাং একজন তেজস্বী তরুণের আগমনে পঞ্চাশ, ষাট, সত্তুরের মতো আশি দশকও কেঁপে উঠুক ভিন্ন নির্মাণে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ঘুমন্ত নারী কিংবা সমুদ্রের বে...খাড়ি তটিনী বহু কবিতার উপজীব্য। কিন্তু কবিতা কি গগনচুম্বী কোনো প্রাসাদের শীতল বাহু? না। সুতরাং একজন কবি তার অন্তর্দৃষ্টিতে যে তীক্ষ্ণতা, যে সমাজ-বৈষম্যতা, রক্ত-মাংসের উন্মুখতা দেখতে পান তা-ই তুলে ধরতে সচেষ্ট। কিন্তু কাল তাকে কতোটুকু দুঃস্থতার শিকড়ে নিগৃহিত রসের আস্বদনে পেঁছে দেয়? কিংবা কবি পেঁছতে আদৌ সক্ষম কিনা তাওতো তারা লক্ষ্য করেনা। বরং তরুণদের সব-সময় একটাই প্রচেষ্টা কীভাবে দৈনিকে, সাপ্তাহিকে নামটা ছাপানো যায়। আমার মনে হয় একজন তরুণ কবির প্রথম ও প্রধান কাজ হওয়া উচিত তার ভিতকে, মৌলকে পোক্ত করা। আর এর জন্যে প্রয়োজন প্রচুর পড়াশুনো। আমাদের তরুণরা দুটো লাইন কবিতা লিখেই সার্টের কলার ঝুলিয়ে, বুক টান করে চলে। চলনে-বলনে তার কবিত্ব প্রকাশ করে। অথচ কবিতা তথা সাহিত্য সম্পর্কিত পড়াশুনোর পূর্ণতায় এদেরকে খুঁজে পাওয়া যায়না।

সদ্যোজাত শিশুর মতো ভূমিতে প্রতিশ্রুত সর্বভুক সৌন্দর্যের সারল্য আত্মসমর্পণের সমতায় একদিন এসে যায় তাদের ক্লান্তি। নিঃশেষ হয়ে যায় ঘাতকের বীভৎসতায়। বাস্তবের পবিত্রতা কিংবা দ্বিধাহীন বক্তব্যের বিশুদ্ধতা এদের কবিতায় নেই। শুধু ভিতরের আবেগঘন মূর্খতারই পঙ্গুত্ব প্রকাশ পায়। এমনকি কোনো কোনো তরুণ কিছু না জেনে-শুনেই বিচিত্র ঘোষণা ও বিবৃতিতে কবিতাঙ্গনকে করে তোলে হাস্যমুখর এক প্রতীকী।

কবিতার আঙ্গিক ও শব্দ নির্বাচন কিংবা বিচিত্র ভোগমত্ত উৎসর্গিত উন্মাদনাকে ব্যাক্তিক মহার্ঘ আর দৈবিক উন্মিলনকে এরা বুকে জড়িয়ে রাখে উগ্র-ধার্মিকের মতো। অথচ এরই ধ্বংসস্তূপে এদের মৃত্যুকে ঠেকানো দায় হয়ে পড়ে। কাজেই যৌবনের পুরোপুরি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উজ্জ্বল অর্থময় উন্মোচনের মাধ্যমেই অবির্ভূত হয় প্রতিশ্রুতিশীল একজন তরুণ। পুরোনো কলা-কৌশল, রুক্ষ ও কর্কশ বিশ্লেষণ নয়, বরং প্রতিভাদীপ্ত স্বাতন্ত্র্যতায় স্পষ্ট ব্যাক্তিত্বের প্রতি [illegible] প্রত্যেক তরুণ কবির উচিত বলে আমি